হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সাথে

কবিতা
প্রবন্ধ
গল্প
মুক্তগদ্য
নাটক
শিশুশিল্প

বিশেষ পাতা
চরিত্র

“পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন”

শ্রাবণ সংখ্যা ১৪২৭

হিরণ্যগর্ভ
(বাংলা সাহিত্য পত্রিকা)
শ্রাবণ সংখ্যা ১৪২৭ প্রকাশ: ২২ শে শ্রাবণ, ১৪২৭ (ইংরেজি ৭ই আগস্ট, ২০২০)
বিষয়: "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"

প্রকাশক: শুভ্রদেব সেন
সাম্মানিক প্রকাশক: শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার

প্রচ্ছদ: সুভম মুখার্জী (হিরণ্যগর্ভ)
কল্পিতা পাল (চরৈবেতি)

© হিরণ্যগর্ভ পাবলিকেশন হাউস, ১৪২৭

মূল্য: ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা)

'হিরণ্যগর্ভ পাবলিকেশন হাউস'
২৩/২০৫, VBHC Vaibhava
আনেকাল মেইন রোড, ব্যাংগালুরু, কর্ণাটক, পিন – ৫৬২ ১০৬
ই-মেল: hiranyagarvo@gmail.com ; ওয়েবসাইট: www.hiranyagarvo.in

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সাথে

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

বিষয়: **“পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন”**

শ্রাবণ সংখ্যা ১৪২৭

প্রকাশ: ২২ শে শ্রাবণ, ১৪২৭

ব্যাংগালুরু • শিলিগুড়ি

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

শুভ্রদেব সেন, প্রধান সম্পাদক, হিরণ্যগর্ভ ১

প্রবন্ধ

কলেরার জীবাণু আবিষ্কার : *মানস প্রতিম দাস* ২

বাংলার প্রথম উপন্যাস ফুলমতি ও করুণা কি আদৌ কোনোদিন প্রাপ্য মর্যাদা পাবে? : *শৌভিক রায়* ৮

কবিতা

প্রসঙ্গ কবিতা : *বীথি সরকার, সহযোগী সম্পাদক* ১০

মধ্যরাত : *প্রশান্ত দেবনাথ* ১০

রাত্রি জাগে বিমর্ষ আঁধারে : *রবীন বসু* ১০

অদিতিকে : *কল্পরূপ পাল* ১১

অসুখ : *সুমন মল্লিক* ১১

পৃথিবীর বর্ম : *দুর্গা শংকর দাস* ১২

মুক্তি : *তরুনার্ক লাহা* ১২

জ্বলে সময় : *সুস্মিতা কৌশিকী* ১২

প্রতিরোধ : *দেবপ্রিয় হোড়* ১২

উদ্বাস্তু শৈশব : *স্বপ্ননীল রুদ্র* ১৩

সত্যের নাম শিব : *সুফল বিশ্বাস* ১৩

মৃতের পৃথিবী : *অনিন্দ্য পাল* ১৩

আষাঢ়ের কথা – ১ : *রবীন বসু* ১৪

ঘরে বাইরে : *উদয় সাহা* ১৪

জানি দেখা হবে : *তৃণা কানুনগো* ১৪

গদ্য

প্রসঙ্গ গদ্য: *পৌলোমী সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক* ১৫

মিডিয়া তো সমাজেরই প্রতিবিম্ব : *অজন্তা সিনহা* ১৫

একটি স্বপ্নের প্রতিবেদন : *সত্যম ভট্টাচার্য* ১৭

কত রকমের মানুষ দেখি, কত কিসিমের জীবন দেখি : *সুবীর সরকার* ২০

বিষণ্ণ ছোটবেলা : *ডা: সোমা মৈত্র* ২৩

অসুখের দিনগুলো এবং কিছু ভাবনা : *শুভময় সরকার* ২৫

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

মুক্তগদ্য

আয়ু : *শুভম তুহিন* ২৭
গন্তব্যহীন : *যাজ্ঞসেনী* ২৭

গল্প

জিয়নকাঠি : গীর্বাণী চক্রবর্তী ২৮
দ্য ওল্ড উওম্যান অ্যান্ড লকডাউন : ডাঃ শর্মিষ্ঠা দাস ২৯

নাটক

যদি মানুষ হই ... : তমোজিৎ রায় ৩২

==

চরৈবেতি

==

আনন্দের পরিক্রমা : *মিহির দে* ৩৫

ভ্রমণ কাহিনি

সিকিয়াঝোরায় নৌকা ভ্রমণ : *মিহির দে, সহযোগী সম্পাদক* ৩৫
ঝড় বাদলের যাত্রাপ্রসাদ : *দেবপ্রিয়া সরকার* ৩৬
শৈলশহর কালিম্পং : *বিনীতা সরকার* ৩৮
নৈঃশব্দের বাতিঘর তুরতুরিখণ্ড এবং পথ, পথিকের জার্নাল : *নীলাদ্রি দেব* ৪০
পাইন ঘেরা লাভা ও লোলেগাঁও এর পথে : *হৈমন্তি মজুমদার* ৪২

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান

জলে জ্বলে স্মৃতি : *কূর্মনাড়ী* ৪৪

==

তুলিকলম

==

ছোটদের ইচ্ছেডানা এবং ছবি আঁকা: *সুভম মুখার্জী, সহযোগী সম্পাদক* ৪৭

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

শিশুশিল্প

অহেলী মাঝি	৪৮
কঞ্জনাভ মৈত্র	৪৮
আদিত্য সিনহা	৪৮
সাত্যকি আচার্য	৪৯
ধৈবত বিশ্বাস	৪৯
দিবিজা হোড়	৪৯
ঋষভ সেনগুপ্ত	৫০
শতক্রুতু ব্যানার্জী	৫০
মিতাংশু পোদ্দার	৫১
নভোদিতা পাল	৫১
রুদ্রনীল সরকার	৫২
অভীপ্সা ব্যানার্জী	৫২
হৃদিকা দাস	৫৩
সৌরদিত্য রায়	৫৩

=========

সম্পাদকীয়

অসুখের প্রকার যাই হোক না কেন তিনটি প্রধান স্তরে আমরা অসুখকে অনুধাবন করতে পারি। একদম বাইরের শারীরিক স্তরে, মধ্যস্তরে বা মানসিক স্তরে এবং সর্বোপরি গভীরতর স্তর শক্তিস্তরে। এই স্তর গুলিতেই লুকিয়ে থাকে কারণ আর বাকিটা কাল্পনিক। এই কারণে বোধহয় এটা হচ্ছে অথবা অন্যকারণে সেটা বা সবকটি কারণই এটা-ওটা ঘটাচ্ছে - এমনই কাল্পনিক আমরা।

যখন একটি মানব শরীরকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি আমাদের বোধ, বুদ্ধি, উপলব্ধি স্থূলতা পায় আর অসুখ অস্তিত্ব পায় এই স্থূল বিচারের আড়ালে। আমরা তাই-ই বুঝি বা বোঝার চেষ্টা করি যা আমাদেরকে একটা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেয়, একটা যুক্তি দেয়, এক ধরণের সর্বস্বীকৃতি দেয়। এই নিরিখে যদি একটি সুন্দর সুগন্ধি ফুলকে বুঝতে হয় আমরা তখন কি করি? প্রথম যে কাজটা করি তা হল ফুলটিকে গাছ থেকে তুলে ফেলি – অসুখের শুরুটা এখানে। তারপর দল পাপড়ি পর পর আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করি, ফুল কি! নিঃসন্দেহে অনেক জ্ঞানলাভ করি কিন্তু ফুলটিকে তার অস্তিত্ব হারাতে হয়। আমরা ফুলটিকে তার সামগ্রিকতায় আর পাই না বা তার অস্তিত্ব যা একটি বীজের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে সবুজ করার ক্ষমতা রাখে তা থেকে বঞ্চিত হই।

আমাদের বাড়ির বাগানে আমরা ফুল পছন্দ করি কিন্তু তা ফোটাবার জন্য কোনো বিজ্ঞানের অতো দরকার পড়ে না, কাজে দেয় না ফুলকে কেটে কুটে জানা কোনো জ্ঞানই। একদিন সকালে ফুল এমনি ফোটে – তার আগে অবধি আমরা গাছের গোড়াতে জল দিই, বর্জ্য পদার্থ দিই, গাছটিকে আলোতে রাখি, এইমাত্র। গাছের কাছে ফুলের ইতিবৃত্তান্ত জাহির করে ফুল ফোটাতে হয় না। ফুল একটি পরিণাম ও বৃহৎ সম্ভাবনার সেতুস্বরূপ। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক, আমরা যদি হঠাৎ একটি সাপ দেখি আমরা কি করি? প্রথমে আমরা ভয় পাই, তারপর নানা কথা ভেবে একটু সাহসী হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করে একটা লাঠি খুঁজি, হয়ত সাপ! সাপ! বলে চিৎকারও করি। এগুলোর সাথে সাপ প্রাণীটার কোনো সম্পর্ক নেই। মুস্কিল হচ্ছে এটা কি সাপের দোষ? না, একেবারেই নয়। মানুষ সাপের খাদ্য তালিকাতেও নেই, তাহলে সাপকে দেখলেই মারার প্রবণতা কেন? কেননা ঐ যে আমরা জানি, সাপের বিষ আছে। প্রাণীটির প্রতি হিংসার বহিঃপ্রকাশই আমাদের একমাত্র আবেদন। প্রাণীটির অস্তিত্বের অন্য কিছুই আমাদের আর মনে আসে না, অসুখটা কি সাপের? না-না-না! সকল প্রাণীই তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, সাপ জানে তার বিষ শিকার করে খাবার খাওয়ার জন্য – হয়তো প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করা যায়।

ছোটোখাটো সমস্ত প্রাণী ও গাছপালা সম্বন্ধে একই জিনিস খাটে। আমরা মানুষ হিসাবে আসলে জেনে নিতে চেষ্টা করি কে আমাদের উপকারী- কে অপকারী, কে ভালো- কে মন্দ, কে কাজে লাগে – কে লাগে না, কে আমাদের কাছে সুন্দর - কে নয়। অসুখের গোড়াটা এখানেই। আমাদের ধারালো বুদ্ধি দিয়ে আমরা আগে আলাদা করে নিই তারপর ঐক্যের কথা বলি। অসুখ সুখেরই উল্টো আর দুঃখের দোসর। শুরুতে কারণ সম্পর্কে বলছিলাম, হ্যাঁ! অসুখের কারণ খুঁজে বের করাটা জরুরী। এটা মনে করে প্রত্যাঘাত করাটা ঠিক নয় যে পৃথিবীটা আমাদের পর হয়ে উঠছে তাই জোর করে কেড়ে কুড়ে বাঁচতে হবে। পৃথিবী সর্বোপরি সৃষ্টির অধীনে সমস্ত প্রাণকে রাখারই চেষ্টা করছে। হ্যাঁ! সমস্ত প্রাণকেই, শুধু মানুষকে নয়- কারণ সেটা হয় না। তাই এই যাবতীয় অসুখের ওষুধ আমাদের ভিতরেই। আমাদের আদৌ কোনো প্রাণকে রাখার প্রচেষ্টা করার কারণ নেই যদি না আমরা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকি! হয়তো এই সত্যটা আমরা বিশ্বব্যপী এই দীর্ঘ লকডাউনে বুঝতে পেরেছি যে আমরা ছাড়া আসলে এই পৃথিবীটা অনেকটা সুন্দর সতেজ হয়ে উঠেছে। আমরা যখন নিজেদের প্রয়োজনে গাছ কাটি সেই গাছগুলির বীমা হিসাবে নতুন চারাগাছ লাগাতে ভুলে যাই। অসুখটা আমাদের বানানো পৃথিবীর, আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বোঝা পৃথিবীটার অসুখ এটা। আমরা কাল্পনিক এই বিশাল শক্তিশালী মস্তিষ্কের সুবাদে।

আমরা একে অন্যের থেকে আলাদা মাত্রাগত ভেদে, প্রকারগত নয়। নিজেদেরকে পৃথিবীর অধীশ্বর ভাবতে শিখেছি কেননা তা আমাদের প্রিয় অসুখটাকে একটা দুঃখের মাত্রা দেয়, একটা অসহিষ্ণুতা দেয় এবং আক্রোশের জন্ম দেয়। এগুলো আমরা আদপে ভালবাসি।

হিরণ্যগর্ভ পত্রিকা তার শ্রাবণ সংখ্যাটি একটি বিশেষ বিষয়ের উপর প্রকাশ করছে এটা ভেবে যে সব চাইতে উন্নত যন্ত্রের মালিক মানুষ পৃথিবীর বহু রহস্য ভেদ করেছে কিন্তু চঞ্চল কেবলমাত্র জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবধানে বাঁচার হিসাবটা ভুলে গেছে বলে।

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন" – এটি জীবনানন্দের কবিতার একটি অংশ মাত্র নয়। মৃত্যুকে সামনে দেখে আমরা অন্য প্রাণীর মতো অনুগ্রহের সাথে তাকে আলিঙ্গন করি না কেননা আমাদের বৃথা অভিমান ও দম্ভ আমাদের মনে করায় কিন্তু বুঝতে শেখায় না যে আমরা সত্যকার অমৃতের সন্তান।।

শুভ্রদেব সেন
প্রধান সম্পাদক

২২ শে শ্রাবণ, ১৪২৭

প্রবন্ধ

কলেরার জীবাণু আবিষ্কার

~ মানস প্রতিম দাস

আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের দানে। তাই বলে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান নয়। প্রকৃতিকে বোঝার, জীবনের জন্য অনুকূল বিষয়গুলো জানার, বিপদের দূতকে চিহ্নিত করার জন্য তাকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।দীর্ঘ সে প্রক্রিয়া। আবার, সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতাই বেশি আসে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে। কাঙ্খিত ফল পেতে লেগে যায় বহু বছর। এভাবেই এগিয়েছে বিজ্ঞান। তাই যখন-যখন বিশ্বমারী দেখা দিয়েছে তখন বিশ্ববাসী বিজ্ঞানের কাছে হাত পাতলেও আশু সমাধান পাওয়া যায় নি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকগুলো দশক। কলেরা রোগের সঠিক জীবাণু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। ১৮১৭ সালে প্রথম কলেরা বিশ্বমারী দেখা দিলেও জীবাণু চিহ্নিত করার কাজটা পাকা হয়েছে উনিশ শতকের শেষে।

অলৌকিকে আস্থা

কলেরা যে ঠিক কত সহস্রাব্দ ধরে এ পৃথিবীতে রয়েছেতা বলা খুব কঠিন। ভারতে কলেরার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সময় টুকরো-টুকরো প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক স্টিকার তাঁর বইয়ে লিখেছেন, আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের সমসময়ের একটা প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়েছে গুজরাতের এক মন্দিরে যেখানে কলেরা রোগের উপসর্গের বর্ণনা রয়েছে। তবে ম্যাকনামারা মনে করেন, এদেশে কলেরা রোগের অস্তিত্বের প্রথম নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় ভাস্কো দ্য গামার সঙ্গে ভারতে আসা ইউরোপীয়দের লিখিত বার্তায়। ভাস্কো দ্য গামা ভারতে পৌঁছেছিলেন ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫০১ সালে গ্যাসপার কোরেয়া নামে একজন পর্তুগীজ দেখলেন, কালিকটের শাসকের সেনাবাহিনীতে অন্যান্য রোগের সঙ্গে দেখা দিল কলেরার মড়ক। এমন সে পেটের রোগ যে মাত্র আট ঘন্টায় মেরে ফেলতে পারে একজন মানুষকে। সেই রোগেরই বাড়াবাড়ি রকমের আক্রমণ হল ১৫৪৩ সালে। এত মানুষের মৃত্যু হল কালিকটে যে তাদের সৎকার করার জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এর পরেও ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ব্রিটিশ পর্যটকদের বর্ণনায় পাওয়া গিয়েছে কলেরার স্পষ্ট উল্লেখ। তাঁর ‘অ্যানালস অফ কলেরা’ বইতে ম্যাকফার্সন ১৫০৩ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে চৌষট্টিটা নথির উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে কলেরা ছড়ানোর বর্ণনা পাওয়া যায়। এর সিংহভাগ নিশ্চয়ই ঘটেছিল গোয়াতে যেহেতু ইউরোপীয়ারা সেখানেই এসে নামতেন। কলকাতায় কলেরার উপস্থিতির বর্ণনা দিতে ব্রিটিশের সময় লেগে গিয়েছিল অনেকটাই। ১৭৮৬ সালে কলকাতা ও মাদ্রাজে হসপিটাল বোর্ড গঠিত হওয়ার পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

কঠিন রোগের সঙ্গে দেবদেবী বা অন্ততঃ অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক প্রায় অবধারিত। কলেরার আক্রমণের ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গে সেই ভূমিকা নিয়েছে এক দেবী, মুসলমানদের কাছে তিনি ওলাবিবি আর হিন্দুদের কাছে ওলাইচণ্ডী। আসলে কলেরা বাংলায় পরিচিত ছিল ওলাউঠা বা ওলাওঠা নামে। ওলা অর্থাৎ পাতলা পায়খানা এবং ওঠা অর্থাৎ বমি, দুটো মিলিয়ে নামের গঠন। সেই রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন যিনি তিনিই ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী। পুরাণের গল্পকথায় এনাকে অসুরদের রাজার স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে অসুরের নাম মায়া। বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে এই ওলাবিবিকেই ভরসা করত মানুষ, নিয়মিতভাবে তাঁর পুজো হত বাংলায়। এই পুজো যেমন দেখেছেন ইউরোপীয়রা তেমনি তাঁদের রচনায় উঠে এসেছে কালামারির নাম। এ সম্ভবতঃ মৃত্যুর দেবতা যমেরই এক রূপ।প্লেগ ইউরোপে চিহ্নিত ব্ল্যাক ডেথ নামে কিন্তু কলেরা রোগের পরিণতিতে যে মৃত্যু নেমে আসত তাকেও ব্ল্যাক ডেথ হিসাবে অভিহিত করেছেন এই লেখকরা। এই মৃত্যুকেই বাংলায় কালামারি বলা যেতে পারে। আবার কোথাও লোকবিশ্বাস, কালামারি এক দেবতা যিনি সেই রোগ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে অলৌকিকে আস্থা রাখার ব্যাপারটা কোনো নির্দিষ্ট দেশে সীমাবদ্ধ নেই। ইউরোপের ভূখণ্ডে নানা রোগের পেছনে নিজেদের ঈশ্বরের ভূমিকা কল্পনা করেছেন সেখানকার ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান নাগরিকরা। কলেরার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই ধরণের বিশ্বাস রোগের প্রকৃত কারণ খোঁজার পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা আমরা দেখব আলোচনার পরবর্তী অংশে।

ইংল্যাণ্ডের জন স্নো

রোগ সৃষ্টির দুটো তত্ত্বের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চলেছে ইউরোপে। একটার নাম মায়াজমা, বহু প্রাচীন এই তত্ত্ব। মায়াজমার সমর্থকরা মনে করেন যে রোগ তৈরি করে

প্রবন্ধ মানস প্রতিম দাস

দূষিত বায়ু। সেই দূষণ ঘটে থাকতে পারে পচাশাকসব্জি বা ফলপাকুড় থেকে অথবা পচে যাওয়া প্রাণীদেহ থেকে। বদ্ধ জলাশয় থেকেও উঠে আসতে পারে এই খারাপ বাতাস। দূষণের কারণ হিসাবে আরও বহু বিষয় ইচ্ছেমত ঢোকানো হয় এখানে। যেমন, ভূমিকম্পের ফলে বিষ বাষ্প বেরিয়ে এসে রোগের পরিস্থিতি তৈরি করছে এমনও মনে করতে থাকেন এই তত্ত্বের অনেক অনুসারী। ব্যাপারটাকে আরও ধোঁয়াটে করা হয় আবোলতাবোল বিষয়ের সন্নিবেশ করে। গুরুত্ব দেওয়া হয় জ্যোতিষকে। এমনকি হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খ্রী পূ), যাঁকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলা হয়, তিনিও বলতেন যে জ্যোতিষ যে জানে না তাঁর চিকিৎসা করার অধিকার নেই। গ্রীস ও রোমের চিকিৎসক ক্লদিয়াস গ্যালেনাস (১২৯-২০১ খ্রী) মায়াজমা তত্ত্বের বিস্তার করেন। শরীরের বিভিন্ন উপাদানের (humors) ভারসাম্যের সঙ্গে দূষিত বায়ুর সম্পর্ক রচনা করেন তিনি। এই তত্ত্বকে তিনিই একটা বৈজ্ঞানিক মাত্রা দেন, বলেন যে দুটো শর্ত পূর্ণ হলে তবেই রোগ সৃষ্টি সম্ভব। একটা হল দূষিত বায়ুর মধ্যে রোগ ঘটানোর উপযুক্ত বীজের (seed) উপস্থিতি আর দ্বিতীয়, বায়ুর সংস্পর্শে এসে উপাদানের ভারসাম্য বদলে যাওয়া যার ফলে দেহ রোগে আক্রান্ত হয়।

অন্য যে ভাবনা রোগবালাইয়ের কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হত তা হল কনটেজিয়ন তত্ত্ব। ইংরেজিতে কনটেজিয়াস ডিজিজেস বলতে বোঝায় সেই সব রোগ যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছোঁয়া থেকে এবং সামান্য দূরত্ব থেকে ছড়াতে পারে। বাংলায় একেই আমরা বলি ছোঁয়াচে রোগ। ১৫৪৬ সালে ইতালিয় চিকিৎসক গিরোলামো ফ্রাকাসতোরো (১৮৭৮-১৫৫৩) তাঁর নিজের ভাষায় লেখা বিখ্যাত বইতে এই তত্ত্বের কাঠামো দাঁড় করান। গ্যালেনের বীজের ভাবনা এখানে প্রসারিত হল। সরাসরি ছোঁয়াতে যেমন সেই বীজ ছড়াতে পারে তেমনি কাপড়চোপড় বা ব্যবহৃত সামগ্রীর মাধ্যমেও ছড়াতে পারে রোগের বীজ। আবার সামান্য দূরত্ব থেকে হাঁচি-কাশির মাধ্যমেও সে বীজের ছড়িয়ে পড়া সম্ভব। প্লেগে আক্রান্ত ইউরোপ চতুর্দশ শতক থেকে খুব ধীরে-ধীরে এই তত্ত্বের দিকে ঝুঁকছিল। কলেরার জীবাণু চিহ্নিত করা সম্ভব হল এই তত্ত্বে আস্থা রেখে।

১৮৩১ সালে যখন ডাক্তার জন স্নো (১৮১৩-১৮৫৮) তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করছেন তখনই কলেরার প্রথম উল্লেখ দেখা যেতে লাগল সংবাদ মাধ্যমে এবং চিকিৎসকদের লেখালেখিতে। ১৮৫৪ সালের মধ্যে ইউরোপের ভূখণ্ডে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে গেল। এমনিতে প্রসূতিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করলেও রোগটা ভাবাতে লাগল স্নোকে। ১৮৪৯ সালে তিনি একটা প্রচারপত্র তৈরি করে ফেললেন এ বিষয়ে, শিরোনাম হল 'অন দ্য মোড অফ কমিউনিকেশন অফ কলেরা'। কলেরা রোগকে খাদ্যনালীর সংক্রমণের ফলাফল হিসাবে চিহ্নিত করলেন তিনি। সে সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আজকের মত শৌচাগার গড়ে ওঠে নি সর্বত্র, বর্জ্য সরানোর ব্যাপারটাও ছিল খুব অগোছালো। বাড়িঘর থেকে মলমূত্র, বর্জ্য জিনিস টেমস নদীতে ফেলা হত ইচ্ছেমত। কারখানাগুলোও নিজেদের আবর্জনা হয় নদীতে ফেলত আর নয়ত খোলা গর্তে (cesspool) ডাঁই করত। স্নো বুঝলেন, এভাবে রোগের বীজ ছড়ানোতে সুবিধে হচ্ছে। এমনিতেই নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া ছিল দুষ্কর। বোতলবন্দী করে পানীয় জল বিক্রি করত যারা তারাও সরাসরি নদী থেকে জল তুলে পাঠিয়ে দিত ভাঁটিখানা এবং পানশালায়। এই সব যখন বিশ্লেষণ করছেন স্নো তখনই গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বড় সুযোগ পেলেন যখন সোহো নামে শহরতলির একটা জায়গায় কলেরার ভয়াবহ আক্রমণ দেখা দিল। কাছেই থাকতেন তিনি। কলেরার উৎস খুঁজতে-খুঁজতে ব্রড স্ট্রীটের একটা পাম্পে এসে থামলেন ডাক্তার স্নো। বুঝলেন সেই পাম্পের জল ব্যাবহার করছে যারা তারাই আক্রান্ত হচ্ছে কলেরায়। বৈজ্ঞানিক মত অনুযায়ী একটা তুলনার দরকার ছিল তাঁর। সেটা সম্ভব হল কাছাকাছি থাকা একটা জেলখানা এবং একটা ভাঁটিখানায়। এই দুটো জায়গার বাসিন্দারা নিজেদের চত্বরে থাকা উৎস থেকে পানীয় জল নিত। তাদের কারও কলেরা হয় নি। ১৮৫৪ সালে সোহো নগরের স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গিয়ে স্নো অনুরোধ করলেন ব্রড স্ট্রীটের পাম্পের হাতল খুলে নিতে যাতে সেখান থেকে কেউ জল সংগ্রহ করতে না পারে। প্রথমদিকে তাঁর কথায় কান না দিলেও একটা সময় কাজটা করতে রাজি হল প্রশাসন।

চমকপ্রদ ফলাফল দেখা দিল অচিরে, এলাকায় কলেরার ঘটনা কমতে লাগল হু হু করে!এ সত্ত্বেও স্নো নিজের আবিষ্কারের মূল্য পাচ্ছিলেন না। প্রশাসন তাঁর কীর্তিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ আর ওদিকে ঈশ্বরের অলৌকিক লীলায় বিশ্বাসী মানুষজন কঠিন রোগের কোনো জাগতিক কারণ মানতে চায় না। এই সময়ে আরও নিখুঁত হওয়ার দরকার ছিল, চিহ্নিত করা প্রয়োজন ছিল যে ব্রড স্ট্রীটের পাম্পে সংক্রমণ এল কোথা থেকে।দেখা গেল, ওই রাস্তারই এক বাড়ির বাচ্চার কলেরা হয়েছিল কিন্তু তার উৎস ছিল অন্য কোথাও। বাচ্চার মা শিশুর কাঁথা বা ডায়পার ধুয়ে সেই জল ফেলে দিয়েছিল পাম্পের কাছাকাছি থাকা একটা গর্তে। স্নো

বুঝলেন, এই গর্ত থেকেই লীক করে জীবাণু ঢুকেছে পাম্পে। পাওয়া গেল সংক্রমণের স্থানীয় গতিপথ। বছরখানেক পরে স্থানীয় এক সংবাদপত্র এই প্রমাণ উল্লেখ করে গর্ত বোজানোর দাবি করল স্থানীয় প্রশাসনের কাছে। নালা-নর্দমা সংস্কারের দাবিও জানানো হল। প্রশাসন কানে নিল না ব্যাপারটা, সংস্কার ঘটতে লেগে গেল আরও বহু বছর।

কলেরার ক্ষেত্রে সংক্রমণ বা কনটেজিয়নের ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারলেও রোগ ঘটানোর জন্য দায়ী বীজকে চিহ্নিত করে উঠতে পারেন নি জন স্নো। অণুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপের চলন সে সময়ে হলেও স্নো সম্ভবতঃ এই কাজে পারদর্শী ছিলেন না। তাই কলেরার ব্যাক্টিরিয়া চিহ্নিত করতে পারেন নি তিনি। প্রায় তাঁর সমসময়ে ইউরোপে দু' জন বিজ্ঞানী জীবাণু নিয়ে এমন কাজ করছিলেন যাকে বৈপ্লবিক বলা চলে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন ফ্রান্সের রসায়নবিদ লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) যিনি পরে জীবাণুতত্ত্বের জনক হয়ে ওঠেন। অন্য জন জার্মানির চিকিৎসক রবার্ট কখ (১৮৪৩ -১৯১০)। এই দু' জনেই মনে করতেন যে রোগ ঘটলে তার মূলে কোনো জীবাণু থাকবে। কলেরার মত বিশ্বমারী নিয়ে এঁরা যে আগ্রহী হবেন তা বলা বাহুল্য। সুযোগটা এল ঐ শতকের আশির দশকে। অকুস্থল আফ্রিকার মিশর।

কখের কীর্তি

কলেরার সঙ্গে মিশরের আলাপ বহু আগে। স্বল্প বা দীর্ঘ সময় বাদে-বাদে এ রোগের ফিরে আসার সঙ্গে পরিচিত ছিল সে দেশের মানুষ। ১৮৮৩ সালে এমনই এক মড়ক দেখা দিল দেশের বিভিন্ন অংশে। কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া শহরের যে সব অংশে গরীব মানুষের বাস সেখানে মৃত্যু হতে লাগল অগণিত মানুষের। একটা হিসেব জানায় যে সে বছরের অগাস্ট মাস নাগাদ প্রত্যেক সপ্তাহে গড়ে পাঁচ হাজার মিশরবাসী মারা যাচ্ছিল কলেরায়। সংক্রমণের তীব্র ভয় দেখা দিয়েছিল পশ্চিম ইউরোপেও। সেটা এমন এক সময় যখন পৃথিবী জোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তাদের লড়তে হচ্ছিল ইউরোপের অন্য দু' একটা দেশের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার প্রধান ক্ষেত্র বাণিজ্য, সেখানে এগিয়ে থাকতে পরিবহনের সহজ পথে দখল বসাতে বদ্ধপরিকর ব্রিটিশরা। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগকারী সুয়েজ খালখুলে দেওয়া হল ১৮৬৯ সালে। কৃত্রিমভাবে তৈরি এই জলপথ পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে পরিবহনের সময় কমিয়ে দিয়েছিল অনেকটা, ভারত আর ব্রিটেনের মধ্যে যাতায়াতের সময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্ধেক। সুয়েজ নির্মাণে ব্রিটেন আর ফ্রান্সের যৌথ বিনিয়োগ থাকলেও ১৮৮০ সাল নাগাদ খালের মধ্যে দিয়ে পরিবহন করা আশি শতাংশ পণ্যই ছিল ব্রিটিশদের। কিন্তু এই পথে প্রাচ্যের পণ্যের সঙ্গে-সঙ্গে এসেছিল আরও কিছু যা মোটেও কাঙ্খিত ছিল না বণিকদের। এসেছিল ছোঁয়াচে রোগ। এর থেকে বাঁচতে বন্দর থেকে দূরে জাহাজগুলোকে নোঙর করতে হত, লম্বা একটা সময় কাটাতে হত জনবসতি থেকে দূরে। নৌ-বাণিজ্যে এই কোয়ারান্টিন প্রথা মেনে চলত সবাই। কিন্তু হাতের কাছে এসে যাওয়া পণ্য এত দিন ধরে বন্দর থেকে দূরে রাখলে ক্ষতি বণিকদের। তাই ব্রিটিশরা কোয়ারান্টিন শিথিল করছিল নিজেদের ইচ্ছেমত। ১৮৮২ নাগাদ তারা নিজেদের দখলে এনে ফেলেছিল মিশরকে, প্রতিবাদ করার জন্য কোনো শক্তি ছিল না সেখানে। ফলে পরের বছর কলেরার জীবাণু সহজেই ঢুকে পড়ল মিশরের সীমানায়।

নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে সমস্যায় পড়ল ব্রিটিশরা। বাণিজ্যের কাছে মানুষের প্রাণকে কোনো মূল্যই দেয় না ব্রিটিশরা, এমন একটা কুখ্যাতি থেকে নিজেদের বাঁচাতে সহজ একটা পথ নিল তারা। দেখাতে চাইল যে কলেরা ছোঁয়াচে কোনো রোগ নয়। ডাক্তার গায়ার হান্টারের অধীনে একটা মেডিকেল টিম গঠন করে পাঠানো হল এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। অণুবীক্ষণ বিশেষজ্ঞদেরসে দলে রাখা হল না সঙ্গত কারণে, কলেরার কারণ হিসাবে কোনো জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার হোক এটা মোটেই চাইছিলেন না শাসকরা। সিদ্ধান্ত জানাতে দু' সপ্তাহও লাগল না চিকিৎসক দলের। তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে কলেরার বিষ মিশরের মাটিতে রয়ে গিয়েছিল ১৮৬৫ সালে শেষ মড়কের সময় থেকে, তার থেকেই ঘটেছে এবারের রোগ। রোগটার সঙ্গে কোনো জীবাণুর সম্পর্ক নেই এবং এ রোগ ভারত থেকে এসে পৌঁছয় নি। হান্টারের কাজে খুশি হয়ে তাঁকে নাইটহুড দিল সরকার। কিন্তু ফরাসী আর জার্মানদের কাছে ব্রিটিশদের মত কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই দুটো দেশ থেকে চিকিৎসক দল যখন পৌঁছল তখন বিদায় নিয়েছে হান্টারের টিম।

ফরাসী দল গঠন করে দিয়েছিলেন লুই পাস্তুর কিন্তু তিনি নিজে যান নি দলের সঙ্গে। নেতৃত্ব দিলেন এমিলি রু। অন্যান্য সদস্যরা হলেন স্ট্রাউস, নোকার্ড ও লুই থুইলিয়ের। ঐতিহাসিকরা বলেন, যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন মহামারী শেষ লগ্নে। কাটাছেঁড়া করার মত যথেষ্ট মৃতদেহ পেলেন না তাঁরা। উল্টে তরুণ ডাক্তার থুইলিয়ের কলেরায় আক্রান্ত হলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে মারা গেলেন। হতাশ এবং শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে

প্রবন্ধ **মানস প্রতিম দাস**

এল ফরাসী দল। এর পরে কখের নেতৃত্বে গেলেন জার্মানরা। কখ নিজে ছিলেন অণুবীক্ষণের ব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শী। মিশরে পৌঁছেই জার্মান দল লেগে পড়ল কাজে, মরা শরীরের অন্ত্রে তাঁরা খোঁজ করতে লাগল রোগের জীবাণুর। সফল হল তাঁদের অনুসন্ধান, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক পর্দার মধ্যে তাঁরা পেলেন কমা (comma) আকৃতির একটা ব্যাসিলাসকে। এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে এই ব্যাক্টিরিয়ার আকার আসলে দণ্ডের (rod) মত, দণ্ডের প্রান্তে রয়েছে শুঁড়ের মত অংশ (polar falagellum). তার ফলে কমা আকৃতির বলেও এই জীবাণুকে বর্ণনা করা যায়।খাদ্যনালীর আরও নীচের দিকেও যথেষ্ট পরিমাণে এই জীবাণুর খোঁজ পেল কখের দল। কিন্তু মহামারীর বিদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে মৃতদেহ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন কখ, জীবাণুর খোঁজে তিনি এমন এক জায়গায় যাবেন যেখানে রোগটা আরও ব্যাপ্ত। তিনি যাবেন ভারতে। ব্রিটেনের ডাক্তাররা স্পষ্ট বুঝলেন, কখ এমন একটা কাজ করতে চলেছেন যা তাঁরা আগেই করতে পারতেন। বিখ্যাত জার্নাল ল্যান্সেট আক্ষেপ করে বলল, কলেরার জীবাণুর আবিষ্কার হতে চলেছে ইংরেজের সবথেকে বড় উপনিবেশে কিন্তু কোনো ইংরেজ সেটা করবেন না!

পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য এক জাহাজ পশু নিয়ে কখের দল পৌঁছল কলকাতায়। যে সব উৎস থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করেছে কলেরার রোগীরা সেইসব জলাশয় চিহ্নিত করা হল এবং কয়েকদিনের মধ্যে জার্মান দল জানাল যে কলকাতার রোগীদের অন্ত্রে সেই একই ব্যাসিলাস পাওয়া গিয়েছে। এটাই হল ভিব্রিও কলেরি, কলেরার জীবাণু। কিন্তু ছোঁয়াচে রোগের পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে আরও যে সব শর্ত তৈরি করেছিলেন কখ তা নিজেই পূর্ণ করতে পারলেন না। ঐ জীবাণু দিয়ে পশুদের মধ্যে সংক্রমণ সৃষ্টি করে একই রোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। নিরাপদ রইল তাঁর বয়ে নিয়ে যাওয়া পশুরা।ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিদ্রূপ করার সুযোগ ছাড়লেন না। সে বিদ্রূপের মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপাদান যতটা না ছিল তার থেকে বেশি ছিল রাজনৈতিক আগ্রহ। কখ অবশ্য বিচলিত হলেন না, ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জার্মান সরকারকে জানালেন যে মিশর ও ভারতে তাঁর কলেরা সম্পর্কিত কাজ সফল হয়েছে। আজ আমরা জানি যে কলেরার জীবাণু মানুষের দেহেই রোগ সৃষ্টি করে, পশুদের শরীরে এই ভূমিকা নেই সংশ্লিষ্ট ব্যাক্টিরিয়ার।

এদিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল জার্মানির অন্য এক জন বিজ্ঞানীর আগ্রহের ফলে। ম্যাক্স ফন পেটেনকফার মানতেন যে ছোঁয়াচে রোগের মূলে থাকে জীবাণু কিন্তু এতেই রোগ তৈরি হয়ে যায় না। মড়ক লাগার জন্য এ ছাড়াও দরকার আরও কয়েকটা বিষয়। তার মধ্যে রয়েছে ভেজা, ছিদ্রযুক্ত মাটি যেখানে কোনো জৈব জিনিস পচছে এবং সেই মাটি ও জীবাণুর সংযোগে তৈরি কিছু একটা বিষাক্ত পদার্থ। অর্থাৎ জীবাণুর ভূমিকাকে খাটো করতে চাইলেন তিনি। নিজের ভাবনার সারবত্তা প্রমাণ করতে পেটেনকফার চিঠি লিখে কলেরার কিছু জীবাণু চাইলেন কখের কাছে এবং পেয়েও গেলেন। এর পর তিনি যে কাজটা করলেন তা মারাত্মক। ফ্লাস্কে করে পাঠানো জীবাণুর দ্রবণের পুরোটাই গিলে নিলেন তিনি! চিঠিতে এবার কখকে জানালেন যে তার শরীরে কোনো উপসর্গ নেই, কলেরা হয় নি তাঁর। পেটেনকফার আসলে সেই মায়াজমা তত্ত্বে ফিরে যেতে চাইছিলেন, জীবাণু গিলে ফেলে নিরাপদ থাকার ব্যাপারটা যেন তাঁর ভাবনার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল। তখন পেটেনকফার জানতেন না যে নিরাপদ থাকার মূল রহস্য তাঁর পেটের মধ্যে অতিরিক্ত অ্যাসিডের উপস্থিতি। কলেরার জীবাণু ক্ষারীয় মাধ্যমে স্বচ্ছন্দ কিন্তু অতিরিক্ত আম্লিক মাধ্যমে আটকে যায়। কখকে ভুল প্রমাণ করতে ব্রিটিশ চিকিৎসকদের উদ্যোগ বজায় রইল, তাঁরা ফ্রান্স থেকে ভারত, সর্বত্র অনুসন্ধান চালিয়ে বললেন যে কখের আবিষ্কৃত জীবাণু বহু রোগীর দেহে খুঁজে পান নি তাঁরা। ভারতে নিযুক্ত একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক ডি ডি কানিংহাম উনিশ শতকের শেষে তো বলেই দিলেন যে আসলে কখ একটা মাত্র জীবাণু আবিষ্কার করেছেন, এমন আরও বহু জীবাণুর আক্রমণে কলেরা হতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় অঞ্চলের মাটির পরিবেশও কলেরা তৈরির জন্য দায়ী বলে দাবি করলেন তিনি। মিশরে কলেরার মড়কের ব্যাখ্যায় ডাক্তার হান্টার যা বলেছিলেন তাঁর স্বদেশীয়দের বলা বা লেখায় যেন তারই প্রতিধ্বনি।এসব দাবিতে অবশ্য কখের কীর্তিকে ম্লান করা গেল না।

পেটেনকফার জীবাণু গিলে নিয়ে নিজেকে নিরাপদ দেখানোর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন, সঙ্গে পেলেন রুশ গবেষক এলি মেচনিকফকে। ১৮৯৩ সালে জুপিল নামে আর একজন জার্মান এই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জীবাণু গলাধঃকরণ করলেন। তিনি কোনোমতে ফিরে এলেন মৃত্যুর মুখ থেকে। কয়েক মাস পরে মেচনিকফ জানলেন যে ফ্রান্সের ভার্সেই নগরের কাছে একটা নদীতে কলেরার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে এবং এলাকার কয়েকজন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি এবার সেখানে পৌঁছে স্থানীয় কয়েকজন মানুষকে রাজি করালেন কলেরা জীবাণুর বিশুদ্ধ দ্রবণ গলায় ঢালতে।

প্রবন্ধ মানস প্রতিম দাস

দেখা গেল, প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়েছেন এবং যেটা মুশকিল হল, একজন মারাও গেলেন। মেচনিকফ নিঃসন্দেহ হলেন যে কখের আবিষ্কৃত জীবাণু দিয়েই কলেরা ঘটানো সম্ভব, অন্য কোনো বিষয়ের প্রয়োজন নেই। একই সময়ে জেইম ফেরান ই ক্লুয়া নামে একজন স্প্যানিশ বিজ্ঞানীও এ ব্যাপারে এগিয়েছিলেন অনেকটা। তিনিও কলেরা জীবাণুর বিশুদ্ধ কালচার ব্যবহার করেন এবং দাবি করেন যে নিজের পদ্ধতিতে তিনি কয়েক হাজার মানুষকে টিকা (inoculate) দিয়েছেন।টিকার সাফল্য দাবি করাতে ফ্রান্সের এক দল ডাক্তার চলে এলেন ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে। কিন্তু বেঁকে বসলেন ফেরান, তিনি নিজের গবেষণার সব তথ্য জানাবেন না! টিকা হয়ত সফল হয়েছিল কিন্তু এমন উচ্চ ক্ষমতার এক দল বিদেশি ডাক্তারের কাছে গবেষণার তথ্য না জানানোয় ক্ষতি হল তাঁর। কৃতিত্ব তো তিনি পেলেনই না উল্টে জীবাণু তত্ত্ব বা কনটেজিয়ন তত্ত্ব আবার অবিশ্বাসের মুখে পড়ল।

হ্যাফকিন ও ফেইফার– টিকার লক্ষ্যে

জীবাণু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুল না থাকে তবে টিকা তৈরির কাজটা সহজ হয়। এক অর্থে কার্যকরী টিকা জীবাণু তত্ত্বকেই শক্তিশালী করে। ঠিক এই ব্যাপারটাই সম্ভব হয়েছিল রাশিয়ার বিজ্ঞানী ভালদেমার হ্যাফকিনের মাধ্যমে। কৃষ্ণসাগরের তীরে বন্দর-শহর ওডেসায় এক ইহুদী পরিবারে জন্ম তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়েই বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন তিনি। ১৮৮১ সালে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার খুন হওয়ার পরে প্রশাসনের আর তার সঙ্গে এক অংশের নাগরিকদের আক্রোশ গিয়ে পড়ে ইহুদীদের উপর। নিয়মিতভাবে হত্যা করা হতে লাগল ইহুদীদের। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অন্যতম মুখ হয়ে দাঁড়ালেন হ্যাফকিন। বহু বার জেলে যেতে হল তাঁকে। সিক্রেট পুলিশও নজর রাখতে লাগল তাঁর উপর। হ্যাফকিন বুঝে গেলেন যে এইসব সামলে তাঁর পক্ষে গবেষণার কাজ এগোনো সম্ভব হবে না। কাজের ক্ষেত্র খুঁজতে তিনি চলে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়, সেখান থেকে ১৮৯০ সালে প্যারিস শহরে। এমিলি রু তাঁকে নিলেন গবেষণার সহযোগী হিসাবে।

ল্যাবরেটরিতে থাকা পশুদের শরীর কলেরা তৈরি করা সম্ভব না হওয়ায় বাধা পাচ্ছিল গবেষণা। কিন্তু হ্যাফকিন হাল ছাড়েন নি। খরগোসের রক্তরসের সঙ্গে জীবাণু মিশিয়ে অপেক্ষা করলেন তিনি, বের করে নিলেন সেইসব জীবাণুকে যেগুলো টিঁকে রইল। প্রক্রিয়াটা আবার চালালেন যাতে সবথেকে শকিশালী, আক্রমণাত্মক জীবাণুগুলো রয়ে যায় দ্রবণে। সেগুলো দিয়ে তিনি সংক্রমণ ঘটালেন খরগোশ আর গিনিপিগদের শরীরে। দেখা গেল যে কয়েকটা মাত্র পশু আক্রান্ত হয়েছে কলেরায়। ১৮৯১-৯২ জুড়ে চলল এই কাজ। সামান্য উৎসাহিত যেমন হলেন তিনি তেমনি কিছুটা হতাশও হলেন। এই সময় রু জানালেন যে কখের সহযোগী রিচার্ড ফেইফার ইঞ্জেকশন দিয়ে গিনিপিগের তলপেটের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সরাসরি কলেরার জীবাণু ঢুকিয়েছেন। এতে কাজ হয়েছে, কলেরার উপসর্গ দেখা দিয়েছে গিনিপিগের শরীরে। হ্যাফকিন নিজেও তাই করলেন, গিনিপিগের মৃত্যু হলে তলপেট থেকে কিছুটা রস নিয়ে অন্য গিনিপিগের শরীরে ঢোকালেন। এর পেছনে কাজ করছিল পাস্তরের নীতি, অনেক পশুদেহের মধ্যে দিয়ে গেলে জীবাণুর আক্রমণের ক্ষমতা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তিরিশ বার এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াতের পর যে জীবাণু পেলেন হ্যাফকিন তা রোগ ঘটানোয় অব্যর্থ। এইবার এই জীবাণু নিয়ে তার শক্তি হ্রাস করার (attenuate) চেষ্টা করতে লাগলেন হ্যাফকিন। সেটা অবশ্য তেমন কঠিন ছিল না। বায়ুর সংস্পর্শে এলে দুর্বল হচ্ছিল, তাপ বা রাসায়নিক পদার্থের ছোঁয়াতেও শক্তি হারাচ্ছিলব্যাক্টিরিয়া। আরও একটা বিষয় দেখে উৎসাহিত হলেন হ্যাফকিন, ইঞ্জেকশন দিয়ে পশুর চামড়ার নীচে জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেই সেগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। ফলে রোগ ঘটার ব্যাপার ছিল না অথচ জীবাণু দেখে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে অসুবিধে হচ্ছিল না পশুদেহের।

এর পর দুর্বল জীবাণু ব্যবহার করে নিজেকেই টিকা দিলেন হ্যাফকিন। এক সপ্তাহ পরে কলেরার বিশুদ্ধ, আক্রমণাত্মক জীবাণু শরীরে নিলেন তিনি। সামান্য শারীরিক অসুবিধে তৈরি হলেও সুস্থ রইলেন হ্যাফকিন। এবারে এই টিকার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটাতে তিনি রাশিয়ার দ্বারস্থ হলেন, এক কথায় তারা খারিজ করে দিল হ্যাফকিনের প্রস্তাব। তখন তিনি ভারতে যেতে মনস্থ করলেন। ভূতপূর্ব ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের মধ্যস্থতায় তিনি ঢোকার সুযোগ পেলেন এ দেশে। কিন্তু প্রথমবারের টিকাদান পর্ব তেমন সুখের হল না। একদিকে ঈঞ্জেকশনের ব্যাথা সইতে আপত্তি জানালেন স্থানীয় মানুষজন, সামান্য যে শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছিল তাতেও রুজি -রোজগার মার খাচ্ছে বলে অভিযোগ করল তাঁরা। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক বৈধতার প্রশ্ন তুললেন ব্রিটিশ ডাক্তাররা। পশুদের শরীরে প্রকৃত কলেরা সৃষ্টি করতে পারেন নি হ্যাফকিন, এই অভিযোগ আনলেন তাঁরা। কিন্তু রুশ বিজ্ঞানীর আসল সুযোগ এল

প্রবন্ধ মানস প্রতিম দাস

১৮৯৪ সালে যখন কলকাতার এক বস্তিতে কলেরার মড়ক দেখা দিল। তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দুশো বস্তিবাসীর মধ্যে একশো ষোলো জনকে টিকা দিলেন তিনি। টিকা নেওইয়া সব মানুষ বেঁচে গেল কিন্তু টিয়া নেয় নি যারা তাদের মধ্যে মারা গেল অনেকেই।এই সাফল্যের পরে অসমে পৌঁছে নিজের কাজ চালিয়ে গেলেন হ্যাফকিন। কুড়ি হাজার মানুষকে টিকা দিলেন তিনি, এর মধ্যে কলেরায় মারা গিয়েছিল মাত্র দু' শতাংশ। এবার আর ভুল ধরার সুযোগ পেলেন না ব্রিটিশ ডাক্তাররা। কখের জীবাণুর আবিষ্কারকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হলেন তাঁরা, হ্যাফকিনের কৃতিত্বের সামনে মাথা ঝোঁকাতে হল সবাইকে।

ইতিহাসে চাপা পড়া

পৃথিবীর ইতিহাসের সব পর্যায়েই কিছু মানুষের অবদান হয় অজ্ঞাত থেকে যায় আর নয়ত সেগুলো চাপা পড়ে যায় অন্যদের কীর্তির নীচে। কলেরার জীবাণু আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তেমনি কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি লণ্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার হ্যাসাল জানিয়েছিলেন যে চাল-ধোয়া জলে ভিব্রিও গোষ্ঠীর (genus) প্রচুর জীবাণুর উপস্থিতি দেখতে পান তিনি। অণুবীক্ষণের নীচে এগুলো যখন তিনি পরীক্ষা করেন তখন দেখেন, কখনও সেগুলো লম্বা, বিচ্ছিন্ন সুতোর মত ভাসছে আবার কখনও দলা পাকিয়ে একটা বিন্দুর মত হয়ে আছে। এগুলোকেই কলেরার জীবাণু বলে মনে করা হয়েছিল। রোগীর রক্তে বা প্রস্রাবে এদের উপস্থিতি ছিল না কিন্তু মলের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় ঘোরাফেরা করছিল এগুলো। কলেরার প্রকৃতি নির্ণয়ে আর একজন কীর্তিমানের নাম নটিজ চার্লস ম্যাকনামারা (১৮৩২-১৯১৮)। ভারত তথা এশিয়ায় কলেরার ইতিহাসকার তিনি, বিয়াল্লিশ বছর বয়স অবধি ব্রিটিশ ভারতে চাকরি করে লণ্ডনে ফিরে আসেন ১৮৭৬ সালে, উচ্চতর পড়াশোনার জন্য। তবে ভারতে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগেই একবার তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছিল কলেরায় আক্রান্ত হয়ে। আসলে সমসাময়িক কয়েকজন গবেষকের কাজের কাজ জেনে উৎসাহিত হয়েছিলেন ম্যাকনামারা। কলেরা রোগীদের মল পশুদের খাইয়ে তাদের দেহে কলেরা তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি, সফল হন নি। মাঝখান থেকে তাঁর নিজের শরীরে ঢুকে পড়েছিল রোগের জীবাণু। তাই সুস্থ হতে দেশে ফেরা। লণ্ডনে যখন তিনি সার্জেন হিসাবে কাজ করছেন তখনও ব্যাক্টিরিয়া নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন তিনি। এর মধ্যে বার্লিনে কিছুদিন কখের কাছেও প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেন। ১৮৮৩ সালে মিশরে কলেরার মহামারী ঘটতে যাচ্ছে এটা আন্দাজ করে তিনি অনুমতি চাইলেন সে দেশে যাওয়ার। কিন্তু রাজি হল না সংশ্লিষ্ট দপ্তর। মোক্ষম সময়ে গবেষণার সুযোগ হারালেন একজন দক্ষ বিজ্ঞানী।

তবে এঁদের সবার উপরে যাঁকে স্থান দিতে হবে তিনি ইতালিয় চিকিৎসক ফিলিপ্পো পাচিনি (১৮১২-১৮৮৩)। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরেন্সে অধ্যাপনার সুযোগ পান তিনি। ১৮৫৪ সালে কলেরা ছড়িয়ে পড়ল ফ্লোরেন্সে। পাচিনি মনযোগী হলেন। রোগীর মৃতদেহ নিয়ে ময়না তদন্ত করলেন তিনি, খোঁজ চালাতে লাগলেন অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে। এই পরীক্ষার সময়েই তিনি খুঁজে পেলেন কমা আকৃতির ব্যাসিলাস যার নামকরণ তিনি করলেন ভিব্রিও। উপযুক্ত লেবেল দেওয়া ছবি সহ একটা গবেষণাপত্র লিখে প্রকাশ করলেন তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে চাপা পড়ে গেল তাঁর কাজের কথা। জন স্নো সম্ভবতঃ মৃত্যুর আগে খবর পান নি পাচিনির কাজ সম্পর্কে আর প্রায় তিরিশ বছর পরে রবার্ট কখও জানতে পারেন নি ইতালিয় চিকিৎসকের সাফল্যের কথা। যাই হোক, পাচিনির গবেষণা থেমে থাকে নি। ১৮৬৫ থেকে শুরু করে ১৮৮০ সাল অবধি ধারাবাহিক প্রকাশনায় তিনি দেখান যে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে থাকা কলেরার জীবাণুর আঘাতে কলেরা হয়। এই রোগে শরীর থেকে প্রভূত পরিমাণ জল ও লবণ বেরিয়ে যায় এবং শরীর দুর্বল থেকে দুর্বল হতে থাকে। কঠিন অবস্থায় এক লিটার জলে দশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড গুলে ইঞ্জেকশনের পরামর্শ দেন তিনি। পরে এই চিকিৎসা খুব কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়। কলেরা যে ছোঁয়াচে তা জোর দিয়ে বলেন পাচিনি, সেই সময়ের অন্যান্য প্রভাবশালী ইতালিয় চিকিৎসকদের অনেকেই এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা করেন। মায়াজমার তত্ত্বে বিশ্বাস রাখা এই সব ডাক্তারদের কেউই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আস্থা রাখতে পারেন নি। ফলে পাচিনির কাজ অবহেলিত হয়। হারানো গৌরব পাচিনির কাছে ফিরে এল তাঁর মৃত্যুর বহু পরে, ১৯৬৫ সালে। সে বছর ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন নমেনক্লেচার কলেরার জীবাণুর নামকরণে পরিবর্তন আনে। নতুন নাম হয় ভিব্রিও কলেরি পাচিনি ১৮৫৪ (Vibrio choleraePacini 1854).

****

প্রবন্ধ

বাংলার প্রথম উপন্যাস 'ফুলমতি ও করুণা' কি আদৌ কোনোদিন প্রাপ্য মর্যাদা পাবে?

~ শৌভিক রায়

১৫৫০ সাল নাগাদ অহমরাজকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়নের চিঠি, এখনও পর্যন্ত বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন বলে মনে করা হলেও, গদ্য সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু শুরু হয়েছিল আরও খানিকটা পরে। আসলে দীর্ঘদিন বাংলা গদ্য ছিল দলিল-দস্তাবেজের ভাষা। তবে এই ব্যবসায়িক প্রয়োগের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পরবর্তীর সম্ভাবনা। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা গদ্য শুরুর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন পর্তুগিজ পাদ্রীরা, যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার।

সুসংহত বাংলা গদ্যের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজ কর্মচারীদের মোটামুটিভাবে বাংলা লিখবার প্রয়োজন দেখা দিলে, ইংরেজি, সংস্কৃত ইত্যাদি থেকে অনুবাদের হাত ধরে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে একটি রূপ নিতে শুরু করে। এই ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়, উইলিয়াম কেরি, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮২৩ সালে ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাস`প্রকাশিত হলেও, ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল`কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে মনে করা হয়। আধুনিক বিচারে অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের এই সৃষ্টি কতটা উপন্যাস বলে বিবেচিত হবে তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল`বাংলা গদ্য সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে, একটি যুগান্তকারী ঘটনা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর ঠিক এখানেই প্রশ্নটি উঠছে যে, তবে হানা ক্যাথেরিন লোক্রোয়ার 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ`কে আমরা কিভাবে বিচার করব? কেননা লন্ডন মিশনারি সোসাইটির কর্মী রেভারেন্ড ফ্রাঁসোয়া লোক্রোয়ার মেয়ে হানা ক্যাথেরিনের লেখা বইটি 'আলালের ঘরের দুলাল` প্রকাশের ছয় বছর আগে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং উপন্যাসের গুণাবলীর তুল্যমূল্য বিচারে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল। বাংলা ১৩৮৭ সালে চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'-এর নতুন সংস্করণে সম্পাদক বলছেন, 'লেখিকা চরিত্রসৃষ্টি, পরিবেশসৃষ্টি এবং ভাষার সাবলীল প্রয়োগে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তার জন্য 'ফুলমনি ও করুণা' এখন থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে মর্যাদা লাভ করবে।'

১৮২১ সালে রেভারেন্ড ফ্রাঁসোয়া লোক্রোয়া চুঁচুড়ায় আসেন। ১৮২৬ সালে ১লা জুলাই নিজের সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন হানা। বাড়িতে পড়াশোনার পাশাপাশি, সমাজসেবামূলক নানা কাজে বাংলার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ছিল। ফলে বাংলা শিখতে তাঁর বেশি সময় লাগে নি। মিশনের কাজ আরও খানিকটা শিখবার জন্য, ১৮৪১ সালে তাঁকে ইংলান্ড ও সুইজারল্যান্ডও যেতে হয়। ১৮৪৫ সালে নিশনের কর্মী জে ম্যালেন্সকে বিয়ে করবার পর, বাবা ও স্বামীর প্রভাবে মিশনের কাজে হানা মিশনের কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখকসত্বা প্রকাশ্যে আসে। প্রকাশিত হয় 'ফুলমনি ও করুণা'। কিন্তু রাশভারী বাবা রেভারেন্ড ফ্রাঁসোয়া কোনোদিনই মেয়ের এই বাংলা লেখাকে সমর্থন করেন নি। ফলে একটি উপন্যাসের পর হানা বাবার জীবিতকালে আর কিছু লেখেন নি। ১৮৫৫ সালে তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয় জেনানা মিশন। এই মিশনের কর্মীরা সকলেই ভাল বাংলা জানতেন ও উচ্চ বর্ণের হিন্দু পরিবারের অন্দরমহলে গিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন।

১৮৫৮ সালে আর একবার ইংল্যান্ড ঘুরে এসে, স্ত্রী-শিক্ষা কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব নেন হানা। বাবার মৃত্যুর পর তিনি আর একটি উপন্যাস লিখবার কাজে হাত দিয়েছিলেন। খুব দ্রুত চলছিল লেখার কাজ। কিন্তু ১৮৬১ সালের ২০শে নভেম্বর বিদ্যালয় থেকে ফিরে লিখতে বসে পেটে তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করেন তিনি। কোনোমতেই সেই ব্যথা আর কমে নি। পরদিন সন্ধ্যেতে হানা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে উপন্যাসটি আর সমাপ্ত হয় নি। বাংলা লিখতে লিখতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের রচয়িতা এক বিদেশী মহিলা মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

গদ্য বিকাশের সেই আদি যুগে একজন বিদেশী মহিলার বাংলা শেখাই শুধু নয়, একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখে ফেলা নিঃসন্দেহে একটি চমকপ্রদ ব্যাপার এবং তার চাইতেও বড় কথা হল যে, 'ফুলমনি ও করুণা' আক্ষরিক অর্থেই উপন্যাসের গুণসম্পন্ন। চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় বলছেন, 'প্রেমের এমন একটি স্নিগ্ধ কাহিনী বাংলা উপন্যাসের আদি যুগে বেশি নেই। প্রেম

প্রবন্ধ শৌভিক রায়

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান। আলালের ঘরের দুলাল-এ লাম্পট্য আছে, প্রেম নেই।` হানা কিন্তু তাঁর উপন্যাসে প্রেমের পাশাপাশি সে যুগের বাংলার দারিদ্র -সহ যে ছবি এঁকেছেন, তার উদাহরণ আর

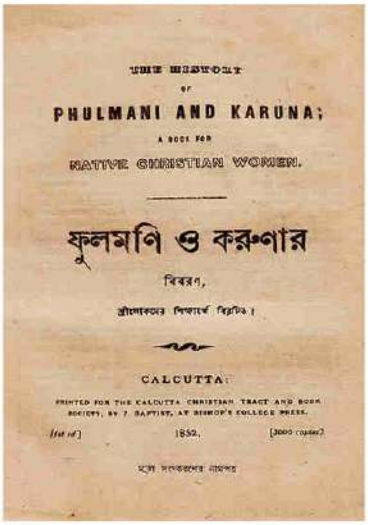
THE HISTORY
OF
PHULMANI AND KARUNA;
A BOOK FOR
NATIVE CHRISTIAN WOMEN.

ফুলমণি ও করুণার
বিবরণ,
স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।

CALCUTTA:
PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, BY J. BAPTIST, AT BISHOP'S COLLEGE PRESS.
1852.

নেই। তখন দুই আনায় পাওয়া যেত সাধারণ জামা, নারকেল তেলের মণ ছিল দশ টাকা। পুরুষদের ছিল মদ-তামাক খাওয়ার এবং জুয়াখেলার নেশা। এসবের জন্য দরকারে চুরি করতেও তারা পিছপা হত না। মেয়েরা বেসন দিয়ে মাথা পরিষ্কার করত। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর বন্ধু বাড়িতে এলে স্ত্রী কথা না বলে অন্দরমহলে চলে যেত।

উপন্যাসে সে সময়ের বাংলার নিচুতলার সমাজ 'তার সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ, ঈর্ষা, কুসংস্কার, কঠোর দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে'। সত্যি বলতে, 'ফুলমনি ও করুণা' প্রকাশের দীর্ঘদিন পরেও, অন্য অনেক সৃষ্টি তার ধারেকাছেও যেতে পারে নি। ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও হানার মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। সেই সময়ের বহু লেখকের লেখা পড়তে গেলে যেখানে অভিধানের সাহায্য নিতে হয়, সেখানে 'ফুলমতি ও করুণা` আজকের দিনেও গড়গড় করে পড়া যায়। হানা জোর দিয়েছিলেন ছোট ছোট বাক্য ও সঠিক যতিচিহ্নের দিকে। ফলে তাঁর লেখা অবোধ্য

হানা ক্যাথেরিন

হয়ে ওঠে নি কখনোই- 'কবিরাজ বুড়ির নিকটে চারি টাকা লইয়া মধুকে এক পান ঔষধ দিয়া দাবাতে তামাক খাইতেছিল, সে আমার কথা শুনিয়া ভিতরে আসিয়া বলিতে লাগিল, মেম সাহেব, আপনি যথার্থ কহিলেন। আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, তিন চারি প্রকার ঔষধ একেবারে খাওয়াইও না, কিন্তু ইহারা আমার কথা মানিল না...। উপন্যাসটি লেখিকার নিজস্ব জবানিতে বলা। নিজেকে ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলেও, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ও তাঁদের জন্য কিছু করবার প্রয়াস উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। ফুলমনি, করুণা, প্যারী, সুন্দরী ও রানীর প্রধান চরিত্র হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উপন্যাসটি 'স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিবেচিত'। নারীচরিত্রের এই প্রাধ্যানের পাশে কিন্তু প্রেমচাঁদ, নবীন, বংশী প্রমুখেরা নিজেদের মতো করে উজ্জ্বল। তবে উপন্যাসের আদি যুগের নিয়মানুসারে ঘটনার বর্ণনায় হানা যতটা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, চরিত্র চিত্রণে তত দেখতে পারেন নি। অবশ্য সেটি প্রত্যাশা করাও সঠিক নয়।

****

কবিতা

প্রসঙ্গ কবিতা

~ বীথি সরকার, সহযোগী সম্পাদক

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে যেমন নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয় ঠিক তেমনি আমরা ঘুরে দাঁড়াই ভীষণ সাহসীও হয়ে উঠি বাঁচার তাগিদে। এবার দেখার ঠিক কোন বিষয়টা আমাদের তাড়িত করছে বা কোন বিষয়কে আমরা জীবনে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। ভয় না সাহস! "পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ" যখন, তখন মানবসভ্যতার জীবন বোধ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেঁচে থাকার অদম্য জেদ ভেতরের খাঁটি মানুষটাকে নিংড়ে বের করে আনছে খানিকটা। ধৈর্য্য-সহ্য-দায়িত্ববোধ-অপেক্ষা ইত্যাদি যেসব ভারী ভারী শব্দ আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে হিমশিম খেতাম আজ সেসবই কেমন যেন বড্ড সহজভাবে মেনে নিচ্ছি, সাবলীলভাবে এগিয়ে চলছি।

এই অসুখের দিনে সাবলীলতার কর্মযজ্ঞে মনের ও পারিপার্শ্বিক যে লড়াই চলছে তারই প্রেক্ষাপটে সেজে উঠেছে পাতার পর পাতা, বিভিন্ন কবিতায়, ছন্দে, অন্তমিলে। কতকি ভেতরের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন লেখনী থেকে। বলাই বাহুল্য যে অনুভব শব্দ দিয়ে গুছিয়ে বলে উঠতে আমরা পারিনা সেই অব্যক্ত কথাগুলোই যেন লিখে রেখেছেন শ্রদ্ধেয় সকল কবিরা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে। অসীম মুগ্ধতা ও একাত্মবোধের যে স্পৃহা আমাদের তাড়া করে বেড়ায়, নিশ্চয়ই এই পাতাটিতে চোখ বোলালে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটবে।

মধ্যরাত

~প্রশান্ত দেবনাথ

মধ্যরাতের ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও বাতাস
আমাকে জাগিয়ে দেয়

পুবের জানলাটা খুলে দিই

মহিষবাথানের পথ মনে হয়
মধ্যরাতে চলে গেছে অনন্তের দিকে

আমার কাঙাল চোখ পাঠ করে
পথরেখা, আর পথের রহস্য খোঁজে

মনে পড়ে যায় পাখিজন্মের কথা...

এইসব মেঘাবৃত কথা আমি
কাউকেই বলি না।

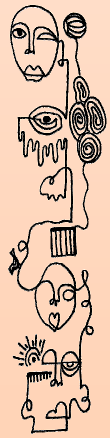

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

রাত্রি জাগে বিমর্ষ আঁধারে

~ রবীন বসু

দিনান্ত ঝুলে আছে খেয়াঘাট ফাঁকা শুনশান
ওপারে অদৃশ্য কারা গাইছে অসহ্য গুণগান।
মৃত্যুর মিছিল নিয়ে নৈঃশব্দ্যের শকট ছুটেছে
অন্নহীন গ্রামদেশ, শূন্যপাতে ক্ষুধাই ফুটেছে।

ফোটেনি আলো শুধু অনাহূত সংক্রমণ বাড়ে
সভ্যতার ভিততন্ত্রে অজানা আতঙ্ক কড়া নাড়ে।
বিশ্বময় মানুষের গৃহবন্দী জীবনের ছায়া
কেঁপে ওঠে কেঁপে ওঠে ভয়েভরা অসহায় কায়া।

দিনমান অন্ধকার রাত্রি জাগে বিমর্ষ আঁধারে
কর্মহীন শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস পরিযায়ী সাঁতারে।
গ্রহ ছেড়ে অন্য গ্রহে জীবিকার সন্ধানে কি যাবে?
জানেইনা পরিবার পরিজন কেমনে যে খাবে!

তবুও অদৃশ্য সুতো ঝুলে আছে অণুজীব ভারে
প্রকৃতি আপন হাতে ভারসাম্য এনে দিতে পারে।

কবিতা

অদিতিকে

~ কল্পরূপ পাল

নীল জ্বরে ঝলসে গেছে নশ্বর ফুসফুস।
ফসিলেই কবিতার খাতা এখন আকাশ বাঁধে
আমিও রোজ দু'বেলা অসাড় মৃত সমুদ্র কাঁধে
জীর্ণ হাড়ের কঙ্কালে চালাই দুরমুশ।

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রহর;
এই শহরের চেনা সব ছবি গেছে ভেসে-ধুয়ে।
অদিতি , তুমি রয়েছ কবে থেকে হাসপাতালে শুয়ে
অসাড় দেহ তোমার ; অসম্ভব জ্বর!

শহরের পথ ঘাট নীরব দর্পন।
জানো, তুমি নেই তাই ধূসর এ নগর জীবন
জন কোলাহলহীন গতিহীন নিস্পন্দ সৃজন
জলমগ্ন বইপাড়া; বিষাদ তর্পন।

হাভাতে মানুষের সম্বল শুধু জল।
বিদ্যুৎহীন শহরে সন্ধে নামলেই কিম্ভূত কালো
স্তব্ধতায় একলা জেগে থাকে বিষন্ন মোমের আলো
তুমি নেই, তাই সব কেমন বিকল!

তুমি নেই তাই গঙ্গাঘাট মরুভূমি
অনড় যানবাহন, জীর্ণ বাতিস্তম্ভের কাহিনী
এ কোন তিলোত্তমার আদলে গড়া মৌন বাহিনী !
দম বন্ধ হয়ে আসে ----ফিরে এসো তুমি।

তোমাকে ফিরতেই হবে অদিতি আবার -
মুমূর্ষু এ শহরের ধূষর ক্যানভাসে তুলি ধরো,
রঙের শ্রাবণ হয়ে শুধু একবার ঝরে পড়ো
ফিরে এসো---ফিরে এসো আরেকটিবার।।

অসুখ

~ সুমন মল্লিক

১
স্বর্গ ও বিসর্গের মাঝে যতটুকু বাকি রয়েছে সুখ,
তার গভীর থেকে গভীরে লুকিয়ে রাখি যাবতীয় অসুখ –
কিছু কাগজের ওপর বৃষ্টির মতো ঝরে,
কিছু আজও বাগদত্তা হয়ে রয়েছে তোমার কাছে ।

২
সংক্রমণের সংজ্ঞাটা যদিও মধ্যবয়সে এসে বুঝেছি,
তবে তার স্পর্শ পেয়েছিলাম বারো বসন্ত আগে ।
আর এখন এই মহামারী ধেয়ে আসা সময়ে
আর কিছু নয়, শুধু নতুন করে তুলি আঘাতগুচ্ছ ।

৩
এত দীর্ঘস্থায়ী অসুখ আর কিছু নেই পৃথিবীতে ।
উপসর্গগুলি বন্ধ ঘরের আধো-অন্ধকারে
ফুটে ওঠে জলছবিতে – কত ছবি... কত জল...
যাদের অতলে স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে মন
আর মনের হা-ক্লান্তির ভেতর ডুকরে ওঠে দেহখানি ।

৪
আঁখি ও পল্লবজুড়ে জোছনা, ঠোঁটে মৃদু পিউকাঁহা...
তোমার নখের আঁচড় আমার ভূগোল পালটে দিত!
অথচ দ্যাখো, গোটা মানুষটাই পালটে আজ শতানীক ।

৫
মাঝরাতের ঝুমুর থেকে স্মৃতির মোহর কুড়োতে গিয়ে
শূন্য হয়ে যাই... আরও শূন্য হয়ে যাই...
অন্ধকারে আলো হয়ে ফুটে থাকা মুখের দিকে তাকাই –
বুঝি, অসুখ আসলে একটাই; কিন্তু তার ভেতর অগণিত
মণিকর্ণিকা ।

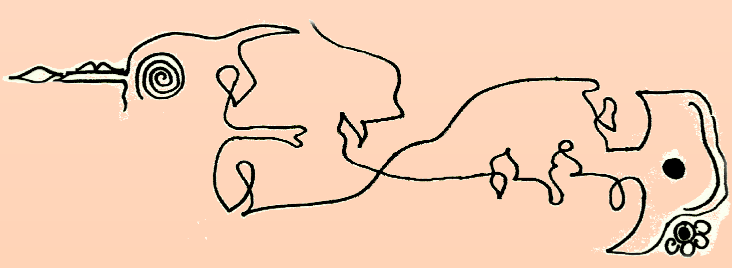

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

কবিতা

পৃথিবীর বর্ম

~ দুর্গা শংকর দাস

থমকে দাঁড়িয়ে আছি বেশ কিছুদিন
হাত পা বেঁধে রেখেছে যেন কেউ
বাতাসের খোঁজে ছুটে যাই নি কোথাও
কোনো পথের ডাক শুনে
বাঁধন খুলে উড়তে ডানা মেলে ধরি নি
পাকা ধানের মতো চাষীদের মাথায় চেপে
বাড়ি ফিরেছি ঘামে ভিজে
পরিযায়ী চোখে কেবলই অনাহার ঘুম
আশ্রয়হীন শয্যাতে বিশ্রাম নিতে চায় অলক্ষ্যে
ধূসর দূরদৃষ্টির ঠোঁটে ঝুলে
ভারসাম্য হারানো বর্ণহীণ পৃথিবীর বর্ম।

মুক্তি

~তরুনার্ক লাহা

যদি বন্ধু হও হাত গুটিয়ে রাখতেই হবে
তোমার আমার হৃদ্যতায় এখন সন্দেহের বীজ
আড়চোখে জরিপ করছি সবাই
অদৃশ্য শত্রু ভর করে নেই তো?
বহুদিন শুনিনি ডোরবেলের আওয়াজ
ছুটে গিয়ে দরজাও খুলিনি অনেককাল
জানলার ধারে বসে দেখছি
আকাশের খন্ড চিত্র, জ্যামিতিক মেঘ
বাউল বাতাস এসে বলে যায় পাশের বাড়ির কথা
কখনো ঘর বয়ে গান শুনিয়ে যায় অতিথি পাখি

দুরন্ত মাঠ আজ ঘুমকাতুরে
খাঁচায় বন্দী পাখিটা মুক্তি দিলাম
আজ মুক্তির কি স্বাদ
অক্ষর জ্ঞান করিয়েছে এই অদৃশ্য শত্রু।

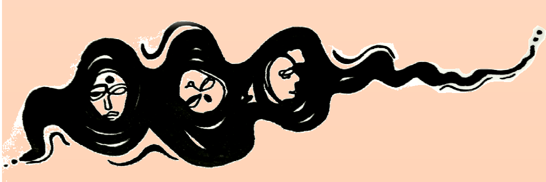

জ্বলে সময়

~সুস্মিতা কৌশিকী

অন্তহীন আগুন
বিশ্বাসের পারা চুঁইয়ে ঢুকে পড়ে ক্লেদ অন্তর্গত সম্পর্কে
কতটা নিখুঁত ঢেকে রাখা যাবে যাবতীয় ক্ষত ও ক্ষমা?
তত্ত্ব ও তথ্যের নিপুন ভাঁজে পরিপাটি হিসেব দৃশ্যত রক্তাক্ত লাশ

সমস্ত শ্মশান সকল গোরস্থান ভিড় করে আছে কফনের শান্তিবার্তা
দেশ ও শাসক কি সমার্থক?

দেশ মানে দেশের মানুষ
শাসক মানে সংখ্যার গরিষ্ঠ চালিয়াতি

চোখে ঠুলি আর কানে নিপাট তুলো গুঁজে মশগুল দর্শক
মুহুর্মুহু বেজে ওঠে কর্কশ হাততালি

আমোদিত প্রাণের পাশে ঘোলাটে চোখ বুজে আসে
ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা -জ্বলে জঠর
লোভ লেলিহান
বিজন বিবেক।

প্রতিরোধ

~ দেবপ্রিয় হোড়

ঘন কালো মেঘ আকাশে,
হিংসার বিষ বাতাসে।
শস্য-শ্যা মলা বাংলা আবার
হানাদারদের কবলে।
ধূলিলুণ্ঠিত 'দয়ার সাগর',
কালিমালিপ্ত শিক্ষার আকর।
কলুষিত আজ বাংলার মাটি,
ছেড়ে যেতে হবে ঘটি-বাটী!
সময় এসেছে লড়াই করার,
একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াবার।
শেষরক্ষার শেষ লড়াইয়ে,
ঝাঁপিয়ে পড়ুক বাংলা আবার।

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

কবিতা

উদ্বাস্তু শৈশব

~ স্বপ্ননীল রুদ্র

এখানে যে ঘর ছিল, নোনাধরা অপরিসরের
এখানে যে কক্ষ ছিল, জোড়া জানালায় শিক লাগা
হাট থেকে কিনে আনা চৌকিখাট, নড়ে, কম ঘের
সেখানে উপুড় হয়ে ছড়া লেখে শৈশব অভাগা

যে শৈশব ছিল ঘরে, তার শুধু লেখা লেখা খেলা
যে শৈশব নোনা-কক্ষে, তার শুধু রঙ, ছবি আঁকা
তুঁত মাখানো নীলাভ ঠোঙা-জুড়বার আঠার ঢেলা
ছবির তলায় লেপে দেওয়ালে সাঁটে, অপটু, বাঁকা

যে ছবি ছিল এঘরে, সেখানে একটি নারকেল তরু
জবা বাগানের পাশে যেমন তরুটি, তনু সরু -
ডাঁটিতে ঝোলানো বহু বাবুইয়ের বিস্ময়-বাসা
ভোরে ঘুম থেকে উঠে কুড়িয়ে এনে জমানো আশা

যে আশা ছিল এ কক্ষে ঘিয়ের মতো গরম ভাতে
লণ্ঠন আলোকে দেখা, উবে যাচ্ছে স্পষ্ট সাদা ধোঁয়া
যে স্বপ্ন ছিল এ কক্ষে জানলা খুলে রাখা গ্রীষ্মরাতে
ঘর গুঁড়িয়ে দিতেই উদ্বাস্তু, দেশ গিয়েছে খোয়া।

সত্যের নাম শিব

~ সুফল বিশ্বাস

একটি কবি ও কবিতার জন্য
একটি শিশুদেব শিশু হয়ে
মৃত মায়ের মুখের কাপড় সরিয়ে
বুকের দুধ খাওয়ার বায়না করতে পারে।
একটি কবিতার জন্য, শুধু একটি কবিতার জন্য
ভীষ্মের ইচ্ছে মৃত্যুর গল্প শুনে
শুকনো রুটি রক্তে মাখিয়ে সন্তানকে নিয়ে
লোহা গাড়ির নীচে শুয়ে পড়তে পারে।
একটি কবিতার জন্য
সদ্য মা হয়ে শিশুর নাড়ি না কেটেও
মাইলের পর মাইল হতভাগ্য মা হেঁটে যেতে পারে।
একজন কবির জন্ম দেবার জন্য
খিদের গল্প জন্ম হতে থাকে পৃথিবীর মধ্যে
জন্ম নেওয়া অজস্র পৃথিবীর মধ্যে।
একটি কবিতার জন্য মানুষ বাঁচানোর
বিজ্ঞানের চেয়ে মানুষ মারার বিজ্ঞান বড়ো হয়ে ওঠে।

মৃতের পৃথিবী

~ অনিন্দ্য পাল

পৃথিবীর মধ্যেই বাড়ছে
মৃতের পৃথিবী,
যেমন বেড়ে ওঠে মায়ের শরীরে
ভ্রূণ-স্নেহ-প্রেম,
কিন্তু সন্তান সব সময় সুখের হয় না -
জরায়ুতে দহন দাবানল
ভালোবাসার ছাই,
এ সন্তান যদি মাটি ছোঁয় -
ঘাসের বনে তবে লুকাবে জীবনবাতাস,
গোনাগুনতি রক্তকণায় বিশ্রাম নেবে
উড়ন্ত যমদূত!
পৃথিবীর মধ্যে আরও এক পৃথিবীর মত
বেড়ে উঠছে প্রতিদিন-প্রতি স্পন্দন,
ক্ষুধার্ত এক নিষ্পাপ শিশু
আর যারা এতদিন দ্বিধাহীন চুষে নিয়েছে
রূপ-রস-গন্ধ প্রকৃতির,
এখন তাদের ফুসফুসে অবিকল

প্রাগ-ইতিহাসের মাংস পোড়া ধোঁয়া!

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

কবিতা

আষাঢ়ের কথা–১

~ রবীন বসু

তোমাকে বলছিলাম সেই আষাঢ়েরকথা
সরপুঁটি ভিজে কাক আর কদম ফুলের কথা
তোমাকে বলছিলাম বিরহী রাধা আর রেললাইন হাঁটছে
হাঁটছে কামিন মেয়েরা পায়ে পায়ে,
পাচার হওয়া হাওয়া
প্রেম প্রেম খেলা নিয়ে জঙ্গিনি শানায় মধ্যদুপুর
নিপাট ধর্ষণ দ্যাখে মুঠো ভর্তি বালু
সব পারাপার পাচারের সীমান্ত অতিক্রম করে

তোমাকে বলছিলাম সেই আষাঢ়ের কথা
সেই মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কথা
সেই ধস নেমে যাওয়া পাড়
জলস্ফীতি ছিন্নমূল বাস্তুভিটা
মানুষ ও পতঙ্গ হয় শিহরিত ফড়িং ডানায়

তোমাকে বলছিলাম এই বর্ষাই সব খাবে- সম্পর্কের উচাটন
নাবাল জমির ওপর বসেছে শকুন
সভ্যতার সিন্ডিকেট ধুয়ে দেয় প্রোমোটার থাবা

তোমাকেই তাই বলছিলাম সেই আষাঢ়ের কথা
সেই চিরবিরহণী শ্রীরাধিকার কথা
আর এই প্রেমহীন চিকন সভ্যতার কথা....

ঘরে বাইরে

~ উদয় সাহা

ইদানিং ঝাঁড়ু বনাম জিভ

ইদানিং প্রচ্ছদে টমাটো সস্

এক পাতা থেকে আরেক পাতায়
আর হাঁসের ডানার উপর রোদের অভিনয়
উঠোন জুড়ে শস্যের কান্না

আমি ডালের বাটিতে ঘূর্ণি আঁকি
ভাত সাজিয়ে পুকুর তৈরি করি
আলুসেদ্ধ আর নুনের আঙুল...

মা এর চোখ সেজে উঠেছে জোছনায়
ভাতের হাঁড়িতে রাতের চাঁদ পচে যায়।

জানি দেখা হবে

~ তৃণা কানুনগো

ভাল নেই গো মা আমি
এত দূরে আছি,
তোমায়ে ছাড়া বড্ড একা
মরে বেঁচে আছি।

আকাশে বাতাসে বিষক্রিয়া
মৃতপ্রায়ে ভুবন,
দিন বয়ে যায়ে বিবর্ণতায়ে
মুছে দিয়ে সব স্বপন।

চারিদিকে বাজে মৃত্যুর দামামা,
অজানা জীবাণুর বলয়,
গ্রাস করেছে সবার জীবন
মারণ এই ভীষণ প্রলয়।

বিনিদ্র রজনী তে ক্লান্তির সুর
গুমট মনের কোণ,
মা গো তোমায় দেখতে নারি,
অশ্রুসিক্ত নয়ন।

দিন আসে দিন যায়,
কিঞ্চিত শান্তির আশায়,
প্রকৃতি তবু আপন মনে
অম্লান স্বামহিমায়।

মা গো তোমায়ে পরছে মনে,
কান্না জমছে বুকে,
মহামারি তে মগ্ন সবে
মরছি অসুখে।
তবু যেদিন উঠবে সেরে
সবুজ এই ধরণী ,
তোমার কাছে দৌড়ে যাব মা,
তুমি আমার আঁখির মণি।
তত দিন তুমি ভাল থেকো মা,
রোগ ভোগ মুছে যাবে,
সব বিরহের আড়ালে মা গো
জানি দেখা হবে।

ছবি: অভিশ্রুতি রায়

গদ্য

প্রসঙ্গ গদ্য

~ পৌলোমী সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক

জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৭ সালে "সুচেতনা " নামক কবিতা তে লিখেছিলেন "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন", আজ ২০২০ সালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এই শব্দ গুলো কে বড় বেশি সময়োপযোগী, বড় বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে কি? আমরা পৃথিবীর ইতিহাস দেখলেই বুঝতে পারি পৃথিবী আগেও বহু বার অসুস্থ হয়েছে। সংকটাপন্ন অবস্থায় এসেছে কিন্তু আমরা হেরে যাই নি। মানব সভ্যতা আবার নিরাময় খুঁজে নিতে পেরেছে। ১৮৮৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্লেগ মহামারীর সময় রাস্তায় নেমে মানব সেবা করেছেন।

নদী চলতে চলতে বাঁক নেয়। গতিপথ পরিবর্তন করে। তেমনি সভ্যতার ইতিহাসে বারবার এই গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। এই সময়ে আমাদের জীবনের গতিপথ বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন কখনই শুধু মাত্র নেতিবাচক হতে পারে না কিছু তেই। অবশ্যই কোথাও কোথাও ইতিবাচকতা লুকিয়ে আছে। আছে নতুন সম্ভাবনা। আছে নতুন আলোর খোঁজ।

অসুখের মধ্যেই থাকে সুখের বারতা। সেই সুখ অসুখ যাত্রাময় দিনের ছবি, পটভূমি, মাটি, শব্দ, আলো অন্ধকার সবটা ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম পাতায় পাতায়।

আমাদের সবার আগামী সুখময় হোক।

মিডিয়া তো সমাজেরই প্রতিবিম্ব

~ অজন্তা সিনহা

ঘুম ভাঙলেই যাঁদের খবরের কাগজ পড়া বা টেলিভিশনে খবর না দেখলে দিন শুরু হয় না, তাঁদের অনেকেই ইদানীং খুব বিরক্ত। আমি নিজে একজন সাংবাদিক হয়েও এই দলে পড়ি। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রায় সব পরিবারই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ধামাধরা। ফলে তাদের পক্ষপাতদুষ্টতা অত্যন্ত প্রকট। এরও পর আছে সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানা হিসেবনিকেশ। বাণিজ্যিক লাভক্ষতির চক্করে হারিয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ খবর অথবা তাকে পরিবেশন করা হয় গুরুত্বহীন ভাবে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তো অভিযোগের তালিকা আরও লম্বা। পক্ষপাতদুষ্টতা সেখানেও। তাছাড়া সারাদিন এক খবর, অতি নাটকীয়তা, তিলকে তাল করা এবং সমাজের ভালোমন্দ বিচার না করে বাণিজ্যিক স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব প্রদান। প্রিন্ট ও টিভির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওয়েব মাধ্যম। এইসব অভিযোগ যেমন ভিত্তিহীন নয়। তেমনই কোন বিবর্তন বা পরিবর্তনের হাত ধরে সংবাদ মাধ্যম আজ প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম হচ্ছে, সেটা বোঝা দরকার। এটাও জানা জরুরি, এ একান্তই অপরিহার্য এক লক্ষ্যবিন্দু ! মিডিয়ার টিকে থাকার নয়া ব্যাকরণ, এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাগিদেই। এদেশে সংবাদ মাধ্যমের আত্মপ্রকাশ ও প্রসার ঘটে মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। প্রতিবাদের হাতিয়ার, সমাজের মানুষের সমস্যা-সংকটের ছবি তুলে ধরা ইত্যাদি আদর্শ নিয়েই পথ চলা শুরু সংবাদপত্রের। তৎকালীন ধনী ও আদর্শবাদী মানুষজনই সেসময় এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়, সংবাদপত্র প্রকাশ, প্রচার ও বিক্রির ব্যাপারটা যথেষ্ঠ খরচসাপেক্ষ একটি কর্মকাণ্ড। দেশের স্বাধীনতা লাভ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এক নতুন পটভূমি তৈরি করলো, যার অন্তর্ভুক্ত হলো সংবাদপত্রও। সামাজিক বিবর্তনের পথ ধরে একদিকে বদলালো সংবাদ মাধ্যমের খোলনলচে। অন্যদিকে প্রযুক্তির কল্যাণে এল নতুন নতুন মাধ্যম এবং অবশ্যই ইন্টারনেট। এইসব কিছু আবহে নিয়েই আজকের সংবাদ মাধ্যম। যাকে মিডিয়া বলতেই বেশি অভ্যস্ত আমরা। সে হোক। আসল কথা হলো তার

রূপরেখা। আজ পৃথিবীর গভীর অসুখ। এই অসুস্থ সময়ে মিডিয়া কি সুস্থ থাকতে পারে? মনে পড়ছে, একবার সাংবাদিকতার একটি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের 'সাংবাদিকতা আজ আর কোনও মহৎ পেশা নয়', কথাটি বলায় তারা প্রবল হতাশ হয়। বাস্তবতা বোঝাতে এটা বলা জরুরি ছিল। আজ যখন গৌরী লঙ্কেশ প্রমুখের মতো প্রতিবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও সমাজবোধসম্পন্ন সাংবাদিককে তাঁর বাড়িতেই খুন হয়ে যেতে দেখি, তখন খুব পরিষ্কার হয়ে যায় ছবিটা। সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন ও অপরাধ জগতের মাঝে ঠিক কোন অবস্থানে আছে মিডিয়া এই মুহূর্তে, এই প্রশ্নের জবাব আর হাতড়াতে হয় না। অর্থাৎ, মিডিয়ার দিকে আঙ্গুল তোলার আগে, আয়নায় নিজেদের মুখটা দেখে নিতে হবে। মিডিয়া মঙ্গল গ্রহ নয়। সমাজে যা যা ঘটবে, তারই প্রতিবিম্ব আমরা দেখবো মিডিয়ার পরতে পরতে।

গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা শুরুতেই বলেছি, পৃষ্ঠপোষকতা! বৃহৎ শিল্প। বহু টাকার লগ্নি। অনেক মানুষের অন্তর্ভুক্তি। মিডিয়া এখন একশোভাগ কর্পোরেট। সেই অনুষঙ্গেই এখন স্মার্টনেস মিডিয়ার শরীর জুড়ে। সেটা মন্দ নয়। কিন্তু এর মূল্য কিভাবে দিচ্ছি আমরা, সেটাই বিচার্য বিষয়। রাষ্ট্রশক্তি থেকে বেসরকারি লগ্নিকরণ, মিডিয়া চলবে সেই স্বার্থরক্ষা করেই, এই তত্ত্ব যেদিন প্রতিষ্ঠিত হলো, সেদিন থেকেই চরাচরে আমূল পরিবর্তন। আমি পয়সা ঢালবো। অতএব আমিই রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি। আমিই ঠিক করবো, কি ছাপা হবে বা হবে না! কি দেখানো হবে বা হবে না। রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণের কথা আর না-ই বা বললাম! এ ব্যাপারে কোনও রাজনৈতিক দল কিছু কম যায় না। এমন এক ক্যানভাসে, যেমন হওয়ার কথা তেমনই ছবি আঁকা হতে থাকে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা যে 'সোনার পাথর বাটি', সেটা আজ সবাই জানে।

ফিরে যাই অভিযোগের কথায়! এটা বোঝা যাচ্ছে, এখানে সম্পাদক মণ্ডলী বা সাংবাদিকদের ভূমিকা একান্ত নগন্য। বেশিরভাগ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মালিকই প্রধান সম্পাদক। খেলাটা পরিষ্কার। প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য টাকার দরকার। যে টাকা দেবে, সেই তো শেষ কথা বলবে। তাহলে, পাঠক বা দর্শক কি চায়, সেটা কি গৌণ হয়ে গেল। মোটেই না। তারা ক্রেতা বা গ্রাহক, যা-ই বলি, তারাই তো লক্ষী। লক্ষীকে মাথায় রেখেই মিডিয়ার যাবতীয় পরিকল্পনা। এতটাই কি সরল বিষয়টা? যদি তাই হয়, তাহলে এত ক্ষোভ কিসের। আসলে এখানে একটা সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ আছে। ক্রেতার রুচিই যদি বদলে দেওয়া যায়, তাদের ভাবনার গতিপ্রকৃতি যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, নিজেদের পণ্য সংস্কৃতির নিরিখে, তাহলে ঠেকায় কে? সেটাই হলো। বদলাবদলির খেলায় মানুষ ভাবতে ভুলে গেল, সমাজের মঙ্গল-অমঙ্গল। অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খান শহরে এলে প্রথম পাতায় তার ব্লো-আপ ছবি ছাপা হবে। টিভির খবরে দিনভর দেখানো হবে ইংল্যান্ডের রানীর সদ্যজাত নাতিপুতির ছবি। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর আর কিছু হতেই পারে না। আর হ্যাঁ, সার্ভে বলে, এই সিদ্ধান্তও আপনার রুচির দাবি মেনেই।

মোদ্দা কথা, মিডিয়া পুরো পণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো সময়ের দাবি মেনেই। আবার সেই সময়ের চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলেই ভিতরের শূন্যতা একদিন গভীর খাদে পরিণত হলো। নেপোটিজম, লবিবাজি, চিটফান্ড জাতীয় অসৎ বিনিয়োগ, সব মিলিয়ে মিডিয়া তার মর্যাদা হারালো। এখন সবাই জানে খবরেরও বিকিকিনি হয়। খবর তৈরি করা যায়। একটি অকিঞ্চিতকর বিষয়কেও বিপুল পরিমান ফুটেজ খাইয়ে লোকের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। জেনে রাখুন, এইসবই আপনি চেয়েছেন বলেই হয়েছে। তাই খবরের কাগজে বা টিভির পর্দায় চোখ রাখতে গিয়ে বিরক্তি আসলে, প্রশ্ন করতে হবে নিজেকেই, আমি কি এটাই পড়তে বা দেখতে চেয়েছিলাম?

রাজনীতি আর মিডিয়ার প্রেম-ভালোবাসা বহুকালের। গত কয়েক দশকে তার মাঝখানে নতুন রং যোগ করেছে অপরাধের দুনিয়া। এখন কার যে কোথায় গাঁটছড়া বাঁধা বোঝা মুশকিল। সত্যি বলতে কি, বুঝতে চাওয়াটাও বিপদজনক। কেউ আর তাই ঝুঁকি নেয় না। যে যেমন করে পারে করে খায়। সংবাদ মাধ্যমও। তবে, গত কয়েক বছরের আর্থিক মন্দা ও সাম্প্রতিক কোভিড ১৯-এর প্রকোপ মিডিয়ার শরীরে একটু বেশি রকমের ক্ষত সৃষ্টি করেছে। বাইরের চাকচিক্য ভেদ করে বেরিয়ে আসছে কঙ্কালসার দেহ। বহু মানুষ বিগত দিনগুলিতে কর্মহীন হয়েছেন। বহু সংস্থা বন্ধ হয়েছে। এ এক অন্য ভয়াবহতা। এই সংকট বহুধা বিস্তৃত। একদিকে বাণিজ্যের কারণে সমঝোতার পথ। আবার সেই পথেও কাজ না হলে মুন্ডু কাটো অসহায় নিরীহ মানুষেরই। মিডিয়া হাউসগুলিতে লোক কমানোর হিড়িকে যোগ্যতা-অযোগ্যতার পরিমাপ ইদানীং খুব বেশি চোখে পড়ে না। সেখানে আবার নেপোটিজম আর লবিবাজির রমরমা। ফলে, একদিকে মানুষের চরম দুর্ভোগ। অন্যদিকে অযোগ্য লোকেরা পাল্লা ভারী করায়, মিডিয়ার সামগ্রিক মান পড়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে গভীর অসুখ আজ গভীরতর। ভাইরাস আক্রমণ হোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এর রেশ একদিন কাটবেই। কিন্তু আমাদের ভাবনা যদি দূষিত হয়ে যায়, সে ক্ষতি চিরকালের। সমাজ বা সংবাদ মাধ্যম, কেউ সেখানে রেহাই পাবে না।

****

গদ্য

একটি স্বপ্নের প্রতিবেদন

~ সত্যম ভট্টাচার্য

"অসুখ বিসুখ হবার পর জিলিপি সন্দেশ" ~ কবীর সুমন

না, জিলিপি সন্দেশের সময় এখোনো আসেনি কারণ অসুখটাই তো সারেনি। আর কবে সারবে তারও কোন ঠিক নেই যেহেতু ওষুধই বের হয়নি আজ পর্যন্ত। এখন কোন দেশ থেকে কিভাবে এই মারণ ভাইরাস গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে যা পৃথিবীকে আক্রান্ত করেছে ভয়ানক মহামারীতে-এই বিতর্ক থেকে যদি সামান্য সময়ের জন্য সরে এসে আমরা নিজেরা আয়নার সামনে দাঁড়াই-প্রশ্ন করি নিজেদের যে এতদিন আমরা কি ঠিক আচরণ করেছি পৃথিবীর সাথে?-বলে দেবার দরকার পরে না যে এই প্রশ্নের উত্তর- না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ এই পৃথিবীর প্রকৃতি-পরিবেশকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে গিয়েছে যথেচ্ছভাবে। একবারও সে ভাবেনি কোথায় যেতে পারে পরিস্থিতিযদি এই প্রকৃতি আর পরিবেশ বেঁকে বসে।আজ মনে হয় সেই সময় এসেছে যখন পরিবেশ মানুষের এতদিনের অত্যাচারের শোধ তুলছে।মানুষ আজ হয়ে গিয়েছে ঘৃণ্যকীট। সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে মানুষের মারণ উল্লাসের উতসব। গৃহযুদ্ধ-মানবাধিকার হনন-মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-পৈশাচিক অত্যাচার,সারা পৃথিবীকে দিনে দিনে পরিণত করেছে নরকে।

আমাদের এই পাহাড়-নদী-অরণ্য ঘেরা অঞ্চল তরাই ডুয়ার্সও কিন্তু এর থেকে বেঁচে থাকতে পারেনি।এখানেও যেমন পৌঁছেছে ভয়ানক মারণ ভাইরাসের থাবা,আবার একইসাথে মানুষের ঘটানো সমস্ত ঘৃণ্য কাজও এই অঞ্চলকে কলুষিত না করে ছাড়েনি। আর এটাও তো ঠিক যে এই মুহূর্তে আমাদের দেশে বা গোটা পৃথিবীতে এমন কোন সর্বজনগৃহীত মনিষী নেই যিনি এই অন্ধকারে সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাতে পারেন। তাই আসুন প্রিয় পাঠক-সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমরা একটু কল্পনার আশ্রয় নিই। ভুলে থাকতে চেষ্টা করি এই দুঃসময়কে। ভাবি গত শতাব্দীর আমাদের দুই প্রিয় মনিষী, যারা শুধু আমাদেরকে নয়, পথ দেখিয়েছিলেন এবং আজও দেখাচ্ছেন গোটা বিশ্বকে-রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, তারা কোনভাবে হয়তো উপস্থিত হয়েছেন হিমালয়ের পাদদেশে আমাদের এই অঞ্চলে। দেখছেন-বুঝছেন-ভাবছেন সব কিছু তাদের মতো করে।কখোনো ভাবছেন তাদের অনুপস্থিতি কোন খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে। তাই আসুন প্রিয় পাঠক-সদ্য সকাল হয়েছে।

ভারতআত্মা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একা একাই পায়চারী করতে করতে বলছিলেন - এখনো আমার ঘুম ভাঙে সেই ছোটবেলায় যেমন ভাঙত, পিতৃদেবের কাছে, হিমালয় পর্বতে, ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্তে।যদিও রাতে আর ভালো ঘুম হয় না আজকাল। এই রাজ্য-দেশ-সমস্ত জায়গার শঠতা আর নিতে পারি না।হিংসা-দ্বেষ-হানাহানিতে জীর্ণ-দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এই দেশ-এই পৃথিবী।বিজ্ঞান প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে দিনে দিনে একই সাথে ধর্মের বর্মও যেন জাঁকিয়ে বসছে মানুষের গায়ে। না খেতে পাওয়া লোকেরা সব ভুলে মেতে থাকছে ধর্ম ধর্ম খেলায়। কাজ নেই-চাকরী নেই-শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় যেন এসব ভুলে থাকতেই বেছে নিয়েছে এই আফিমের পথ। দেখাও হয় না কারুর সাথে আজকাল যে দেশ দুনিয়ার এই পরিস্থিতি নিয়ে শলা করবো। কিছু ত্যাগ করে যে গোটা দেশকে নাড়া দেবো তেমন কিছুও তো নেই আমার কাছে।আবার দিলেও এই অন্ধ-মূক দেশবাসীর তাতে কিছু যাবে আসবে কিনা কে জানে।সেই কবে বলেছিলাম - "আমার যে সব দিতে হবে তাতো আমি জানি"।

হঠাৎ তিনি দেখলেন তার অনতিদূরেই যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। বললেন-কি খবর হে?

স্বামীজী বললেন- আমারো আজকাল আর একদম ভালো লাগে না। যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম আর দেখিয়েও ছিলাম সবাইকে, বলেছিলাম যে ঠিক কিরকম হওয়া উচিত বিশ্বজনীন মানবতার হিন্দু ধর্ম, তার থেকে দিনে দিনে অনেকটাই বিচ্যূত হয়ে গেছে আমার দেশ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কার-ভুল ভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা সব মিলিয়ে দেশ আজ অনেকটাই দিশাহীন।যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমি গোটা দেশ হেঁটে ঘুরেছিলাম, চিনেছিলাম আমার দেশের প্রতিটি মানুষকে,দেড়শো বছর আগে আমেরিকার শিকাগোতে দাঁড়িয়ে সদর্পে বলেছিলাম যে তারা সকলেই আমার ভাই-আমার রক্ত, খুব খারাপ লাগে যখন দেখি তাদের মধ্যেই গড়ে উঠছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। এই ভারতবর্ষের কথা তো ভাবিনি আমি একবারের তরেও। হাতে হাত ধরে সবাইকে নিয়ে একসাথে চলার কথাই ভেবেছিলাম আর বলেছিলাম আমি।বারে বারে বলেছিলাম সেই ধর্মের কথা যেখানে থাকবে না কোন উঁচু নীচু বা ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ, সকলে মিলে একসাথে দেশের মানসিক-আত্মিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অর্থাতসার্বিক উন্নয়নই ছিল আমার লক্ষ্য। আর শুধু আমার লক্ষ্যই বা বলি কি করে-এই তো সনাতন

গদ্য সত্যম ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। বেদ উপনিষদ সব জায়গাতেই তো দেখেছি, সনাতন ভারতবর্ষ সকলকে নিয়ে চলার কথাই ভেবেছে বারবার। যাই হোক,ছাড়ুন-আপনি কিভাবে এখানে?

কবি বললেন-সব ছেড়ে ছুড়ে এই প্রান্তিক শহরে বাস করি আমি এখন।ব্রাহ্ম মুহূর্তে খানিক ঘাসের ওপর পায়চারী করে গিয়ে বসি দিঘীর বাঁধানো ঘাটে।ধীরে ধীরে সূর্য উদিত হয়। তার রাঙা আলোয় ভেসে যায় দিঘীর জল,পাশের গাছ-মন্দির। আর খানিক পরেই চলে আসবে কচিকাঁচার দল।তাদের বর্ণ,শব্দ আর সংখ্যার পাঠ দিই।সারা দেশের শিক্ষানুরাগী লোকজন যখন এখোনো পড়াশুনা করে চলেছে শিক্ষার ওপরে আমার প্রবন্ধগুলো নিয়ে, অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি কিভাবে শিক্ষাঙ্গনে দিনে দিনে প্রবেশ করছে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ,শিক্ষাকে গ্রাস করছে পুঁজিবাদী মানসিকতা। উচ্চশিক্ষার খরচ বাড়ছে এই হারে যে সকলের জন্য তার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রমঃশ। বাচ্চারা আর প্রকৃতি পরিবেশের সাথে একাত্মতা বোধ করছে না। তাই তো আবার শুরু করতে চাইছি গোড়া থেকে, লক্ষ্য এবারে গোটা জাতিকে প্রকৃত শিক্ষিত করে গড়ে তোলা,যাতে আর তাদের মগজ ধোলাই না করা যায়। কাজ করছি এই দূরের শহর থেকেই, কোলাহল-খ্যাতি থেকে অনেক দূরে, নিভৃতে। আর এই শহরটাকেও ভালোবেসে ফেলেছি আমি। এখান থেকে সামান্য দূরে গেলেই জঙ্গল পাহাড়। পাহাড়ে তো প্রচুর সময় কাটিয়েছি। কিন্তু বরাবর সেখানে আমাকে ঘিরে থাকতো গুণমুগ্ধ অনুরাগীর দল। একা হতে পারতামই না। আর একা না হলে কি নিজেকে বা চারপাশকে চেনা বা বোঝা যায়? এখানকার জঙ্গল পাহাড়ে আমি একা হতে পারি।নিশ্চিন্তে পায়চারী করতে পারি পাহাড়ী নদী তীরের নুড়িপাথরের ওপর। খরস্রোতা নদীর বৃহদাকার শিলাখন্ডের ওপর বসে স্বচ্ছ জলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকি, চেয়ে থাকি দূরের নীলচে সবুজ পাহাড়গুলির দিকে। পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রালোকে ঝকঝকে হয়ে ওঠে নদীর জল-অরণ্য-দূরের পাহাড় সব। আর গভীর অরণ্য থেকে ভেসে আসে বিবিধ প্রাণীর ডাক, বিশেষত হস্তীকূলের বৃংহন। কখোনো একা একাই চলে যাই-ঘুরে বেড়াই আদিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো চা বাগিচার ঢালে। দূরের আদিবাসী বসতি থেকে ভাসে আসে ধামসা মাদলের আওয়াজ।কিন্তু তুমি তো তোমার খবর বললে না অনুজ?

স্বামীজী বললেন-আমিও চলে এসেছিলাম এখানে একাকী নির্জনে থাকবো বলে।হিমালয়ের এই পাদদেশে নিবিড় বনানীর মধ্যে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ নদীর পাশে আশ্রয় নিয়ে ভেবেছিলাম কিছুদিন সব ভুলে থাকার চেষ্টা করবো।মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে যখন দেখি আমাকে পুজো করছে সর্বত্র অথচ আমি যা বলেছিলাম বা যা বলতাম-ভাবতাম, তা কেউ বলছে না-ভাবছে না –শেখাচ্ছে না। শুধু আমার সংগঠন বা আমার ছেলেরা তা মেনে চললে বা বললে তো হবে না-আমি তো স্বপ্ন দেখেছিলাম গোটা ভারতবর্ষ সে পথে চলবে, গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবে আমার ভাবনায়। কিন্তু –হে ভগবান –হে রামকৃষ্ণ-এ আমি কি দেখছি।যাদের জন্যে আমি নিজেকে শেষ করে দিলাম-বিলিয়ে দিলাম বিশ্বসংসারের উন্নতির জন্যে-আরো তো কত কাজ করার কথা ছিলো আমার-সে সব না করেই-আর তারাই কি না আমার আদর্শকে এইভাবে তুচ্ছ করলো। সেই যে আলমোড়াতে, সামনে সুউচ্চ গিরিশিখর-সেখান থেকেই আমি ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিলাম আমার মানবতার ধর্ম।এতদিন যা ছিল আঞ্চলিকতাবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-অসহিষ্ণুতা-তাই এবার আরো তার দাঁত নখ বের করে ধারণ করছে তার স্বরুপ। ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জনগণের এ কি রূপ দেখতে পাচ্ছি আমি? আর সামনে কোথাও কেউ নেই যে এই মুহূর্তে সঠিক আলোর দিশা দেখাবে। আমি বারে বারে বলেছি যে এই সুবিশাল দেশের অশিক্ষিত মূর্খ ভারতবাসীই আমার ভাই আমার রক্ত।কিন্তু দিনে দিনে বারে বারে অশুভ শক্তি তাদেরকে বিপথগামী করেছে। কখোনো তারা ডাইনী অপবাদে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে তাদেরই প্রতিবেশীকে,আবার কখোনো না বুঝেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুলে নিয়েছে বন্দুক।হত্যা করছে নিজেরই দেশবাসীকে। আবার কখোনো নিজের ঘর ছেড়ে উঁকি দিচ্ছে অপরের অন্দরমহলে। কৌতূহল কে কি খাচ্ছে-কি করছে। এই খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারটা যদি আমার নিরন্ন দেশবাসীর মুখে অন্ন যোগানোর জন্য হত, তাহলে কোন সমস্যা থাকতো না। কিন্তু এরা তো গরীব মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছে। সাধারণ গৃহী মানুষেরা অনেকেই অবাক হন এই শুনে যে আমি কখোনো আমিষ ভোজনে না করিনি। তাদের কোন দোষ নেই। সাধারণ গেরুয়া জটাধারী দেখলেই তাদের মাথা ঝুঁকে আসে। আমার সংগঠনে আমিষ ভোজনে না নেই। কেন না করবো বলতে পারেন? আমিষ ভোজনে যে পরিমাণ পুষ্টি শরীরে ঢোকে তা তো শরীরকে মজবুত করে আর দেশ মজবুত করতে হলে সর্বাগ্রে চাই মজবুত শরীর।আর মন বা আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি কোন সাধনা হয়? সাধনার পরের স্তরে মন যদি সেই উচ্চতায় পৌঁছায় তখন সে যদি আমিষ ছাড়তে চায় ছাড়বে।তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের বা আত্মার শুদ্ধিকরণ। আজ কাল দেখি অনেকেই বলেন বিভিন্ন জায়গায় দীক্ষার কথা। মনে প্রশ্ন জাগে এরকম দীক্ষা নিয়ে লাভ কি? বা নেবার পরে কি কোন আত্মিক উন্নতি হয়? যদি হয় তাহলে তো ভালো আর যদি না হয় তাহলে তার অবস্থা সেই ময়ূর পুচ্ছধারী

কাকের থেকে অন্যরকম কিছু নয়।

কবি শুনছিলেনসব এতক্ষণ চুপ করে। বললেন-তবে খারাপ লাগে দেখে যে কিভাবে সঠিক পরিচালনার অভাবে এখানে একে একে বন্ধ হয়ে আসছে এই এলাকার সমস্ত চা বাগিচাগুলি।এতদিন শোষণের শিকার হবার পরে এখন অনাহার অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে কালো মানুষগুলো। মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছে বড় বড় শহরে মানুষের লোভ লালসাকে পরিতৃপ্ত করতে। তাদের নিয়ে নাটকে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। সবই আমি জানি-বুঝি। কাউকে না বলতে পেরে অস্বস্তিতে সকাল সন্ধ্যে পায়চারী করি কখোনো ঘরে কখোনো বারান্দায়। কখোনো আবার এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুড়ে বেড়াই এই শহরের রাস্তায় একা একা। সত্যিই এ বড় দুঃসময়।সাম্প্রতিক ভোটচিত্রের হিংসা-অর্থ বিতরণ-জনসমক্ষ্যেই অহরহ কটুকথা-এসবের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করি এখন। কোথায় যাচ্ছে এই রাজ্য-দেশ-সমাজ। মহাকাল সইতে পারবেন তো এত এত পাপ?দেখতে পাচ্ছি সমাজের রাশ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতা-দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসকদের হাতে।সেখানে সাধারণ মানুষ-শিক্ষিত ব্যাক্তিরা হয়ে যাচ্ছে তাদের হাতের ক্রীড়নক। সবই অনুভব করি আমি,বেলা বয়ে যায়,দিন কাটে। তিনি কিন্তু স্বপ্ন দেখি আবারো এক বিপ্লবের যার দ্বারা আবার হয়তো জেগে উঠবে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী-শিক্ষিত-সাম্যবাদী মানুষের চেতনা। তোমার কি মনে হয়?

স্বামীজী বললেন-হিমালয়ের এই পাদদেশে আমি আগে এসেছিলাম কি না ঠিক মনে পড়ে না। তবে এবারে এসে যখন আশ্রয় নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম গোটা ভারতবর্ষে যে হিংসার বীজ ডানা মেলেছে-অসহিষ্ণুতা-যা আক্রান্ত করছে গোটা দেশবাসীকে, তা এখানে এখোনো আসেনি। কিন্তু এই বিষ দাবানল তো মনে হচ্ছে গোটা দেশের কোন আনাচেকানাচে বাদ দেবে না। এখানেও শুরু হয়েছে তাই উন্মত্ততা। নির্মম নৃশংস ভাবে মাঝে মাঝেই কিছু মানুষ পিটিয়ে মারছে নিরীহ একলা মানুষকে। একে একে বন্ধ হচ্ছে চা বাগানগুলি। ফুলের মতো মেয়েদের অত্যাচার করে ফেলে রাখছে। কারা এরা? এদের জন্যে আমি সব ছেড়েছি? এরা কেন আসলো এই পুণ্যতোয়া তিস্তার দুই পাশে-নিবিড় অরণ্যভূমির দেশ-তরাই আর ডুয়ার্সে? এখানে তো সবাই এতদিন ধরে-এতবছর ধরে মিলে মিশে ছিলো, মেচ-কোচ-রাভা-রাজবংশী-সাদ্রী-বাঙালী-নেপালী-ভুটিয়া -লেপচা-সকল ভাষাভাষীর মিলনকেন্দ্র ছিল এই জনপদ। আর এভাবেই গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য। কোন কালো বিষ যে হানা দিলো এই মিলনস্থলে।

তবু আমি দেখবো, শেষ অব্দি দেখবো। এখোনো সব আশা আমি ছাড়িনি, আলোর শেষ হয়তো এখোনো হয়ে যায়নি। কেউ হয়তো ঠিক আসবে, হয়তো কোথাও রুখে দাঁড়াবে একদল ছেলেমেয়ে। আর তারাই হয়তো ঘুরিয়ে দেবে গোটা দেশের মোড়।ততদিন অব্দি ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে সকলকে। আর অন্যায়ের প্রতিবাদটা কিন্তু করে যেতে হবে। তাই বলি-হাল ছেড়োনা বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে... ।।

****

গদ্য

কত রকমের মানুষ দেখি, কত কিসিমের জীবন দেখি

~ সুবীর সরকার

১।

পুষণী রাভা। একটা তিন নদী আর দুই ফরেষ্টের পৃথিবীতে তার জন্ম যাপন।সত্তুর পেরিয়েছেন। এক মেয়ে। বিয়ে হয়েছে কুমারগ্রামে। চারদিকে আদিবাসী পাড়া। রাভাপল্লী। মেচদের পাড়া। কুলি লাইন। গির্জার ঘণ্টা।নাচ গানের মেলা উৎসবের এক লোকায়ত পৃথিবী। রাভা মেয়েরা দল বেঁধে মাছ ধরার নাচ নাচে। তুলে আনে যুদ্ধের নাচগান।ধামসা মাদলে দুলে ওঠে এক অলৌকিক জনপদ। হাতি চিতা হরিণ ময়ূর বাইসন বিষধর সাপ। জঙ্গলে ঘন্টার শব্দ।পুষণী জঙ্গল থেকে খড়ি কুড়িয়ে হাটে বিক্রি করে, শাককচু কুড়িয়ে আনে, ডোবা ও নদীর মাছ ধরে।এটাই তার জীবিকা। আর কোন পেশা নেই। মাঝে মাঝে স্থানীয় রিসোর্টে রান্নার কাজ পায়। নিয়মিত নয়।

২০১২ তে চিলাপাতার পাশে মুঙ্গিলাইনের মাঠে 'করম পূজার' মেলায় পুষণীর সাথে আমার পরিচয়। প্রায় মধ্যরাত অবধি সে আমাকে চালভাজা ও হাড়িয়া খাইয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে শুনে নিচ্ছিলাম রাভাদের গান নাচ জীবন ধর্ম লোকজীবনের বর্নময় সব গল্পগুলি। জার্মান রাভা বাঁধে ওরাও শনিচরি এক্কা ও চিকলিস মারান্ডির কথাও জেনেছিলাম তার কাছেই। এরপর কখন তিনি আমার বন্ধু, আত্মীয় কিংবা মায়ের মতই হয়ে পরেছিলেন। গঞ্জ হাট উৎসবের ভেতর পুষণী আর আমি অনেক ঘুরেছি। শিখেছি। অগণন মানুষ দেখেছি। জীবন দেখেছি।সমৃদ্ধ হয়েছি।

এই লকডাউনের সময় খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলেন পুষণী রাভা। আমার প্রতিনিধির হাত দিয়ে দুই মাসের রেশন ও সামান্য নগদ অর্থ পৌঁছে দিয়েছিলাম।ফোনে কথাও বলেছি সেই প্রতিনিধি মারফত।

বার বার দেখতে চাচ্ছিলেন পুষণী আমাকে।

অবশেষে তার পৃথিবীতে পৌঁছে গেলাম আমি। নুতন শাড়ি ও গামছা নিয়ে। এবং সামান্য কিছু নগদ।

হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমিও আবেগে রুদ্ধ হলাম।

কত কথা হলো। আমাকে ইচা মাছের চচ্চরি, ঢেকি শাক আর মুসুরির ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ালেন।

আমার অনুরোধে একটি মাছ ধরবার গানের অংশ শোনালেন।

আমি ভাগ্যবান, এমন মানুষের ভালোবাসার আলো
আমাকে জড়িয়ে আছে।

ভালো থেকো পুষণী রাভা, আবার আসবো।

২।

আচ্ছা মানুষ কি কখনো তার দেশ হারায়! জন্মমাটি, বেড়ে উঠবার যাপনভূমি ছেড়ে তাকে হয়তো চিরতরে নুতন এক দেশে চলে আসতে হয়। সেই দেশকে নিজের দেশ করে তুলতে হয়। কিন্তু মানুষ কিন্তু আদতে তার দেশ হারান না। তিনি তার অভ্যাসে, তার শরীরের পেশি ও মজ্জায় চিরদিনের সেই দেশকেই আমৃত্যু বহন করতে থাকেন।তাকে বহন করতেই হয়। এই তার নিয়তি। হারিয়ে যাওয়া দেশের নদী, বাড়ি, পথ প্রান্তর আর লোকগান খুব নিবিড় হয়ে বইতে শুরু করে, বয়েই যেতে থাকে তার অন্তর্গত রক্তস্রোতের ভেতরেই।

প্রিয়বালা দাস। বয়স ৭০। কোচবিহার জেলার এক প্রান্তিক গ্রামে বাড়ি। উনি তরুণ কবি বিকাশ দাস মানে বিল্টুর মা।

বাড়ি ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। ওখানেই বেড়ে উঠেছিলেন।বিয়ে হয় সেদেশেই।

তারপর অদ্ভুত এক বিপন্নতা নিয়ে ১৯৬৯-এর প্রথমদিকেই চিরতরে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয় এপারে।এই দেশ তার দেশ হয়ে ওঠে।

কিন্তু তার বন্ধ চোখের ভেতর এক বুক জলখণ্ডের মত জেগে থাকে তার দেশ। পূর্ববঙ্গের বাড়ি। বাড়ির কাছের সুতিগাঙ। সেই গাঙে ভেসে যাওয়া 'হাজারমনি নাও'। তার স্মৃতির গহীনে 'নাও দৌড়ানো' মানে বাইচ খেলা। সারি গান।ময়মনসিংহের বিচ্ছেদী গানের করুন সুর। আমার অনুরোধে সেই গান গেয়েও শোনালেন। কিছুটা সঙ্গের এই ভিডিওতে ধরা রয়েছে। তার চোখে জল।তার চোখে দেশের বাড়ির মায়া। তিনি তো বয়েই চলেছেন তার চিরদিনের দেশ।

প্রণাম মা, আপনাকে।

৩।

লুৎফর হোসেন। মধ্যবয়সী। পেশায় ভ্যানচালক। শহর লাগোয়া গ্রামে থাকেন। দুই ছেলে। বাইরে আটকে এখনো।

লকডাউনের শুরুতে ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ সকালে লুৎফর হোসেন এলেন। হাতে তার স্ত্রীর তৈরি 'সেমাই'।

বললেন-'ভাইজান। ধর ক্যানে। পায়েস খাবু'।

সেমাইয়ের পায়েস আমার প্রিয়।

আমিও একটা লুঙ্গি ও শাড়ি কিনবার টাকা দিলাম। কিছুতেই নেবেন না। একরকম জোর করেই দিলাম।
সাধারণ মানুষ সত্যিই অসাধারণ।এদের ভালোবাসা একেবারে খাঁটি। লুৎফর হোসেনরা সাদামাটা। কিন্তু মহার্ঘ্য।

৪।

মর্জিনা বিবি। কোচবিহার শহরের ফুটপাথে তার ছোট্ট পানের দোকান। অত্যন্ত স্বল্প আয়ের সংসার। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে. স্বামী নেই। ছেলে নেই। বোন ও দুলাভাইয়ের কাছে থাকেন। শহর লাগোয়া গ্রামে। লকডাউনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমি তার পরিবারের পাশে ছিলাম।প্রায় এক মাসের রেশন ও ওষুধের টাকার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।এরপর থেকে সপ্তাহে ২ দিন তিনি আমাকে পৌঁছে দেন টাটকা ঢেকি শাক। না, কিছুতেই তাকে টাকা দেওয়া যায় না। তিনি পয়সা নেন না।আজ তিনি একেন ঢেকি শাক নিয়ে। আমি তুলে দিলাম দুই বোনের জন্য শাড়ি। জামাইবাবুর জন্য লুঙ্গি। ফতুয়া।
ধর্ম নয়। সম্প্রদায় নয়। সব পেরিয়ে শুধু মানুষ। মানবতা।
আমার চোখে জল।
প্রনাম, সোনার বরণ মানুষ; আপনাদের।

৫।

প্রতিদিনই বেরোতে হয়।মানে বেরোতে হয়েছে এই লক ডাউনের সময়ে। কিছু মানুষের কাছে যাই তাদের খোঁজ নিতে। বিগত ৪৫ দিনে এভাবেই পাশে থাকতে চেয়েছি নিজের মতন করে। একদিন গেলাম কোনামালি ও বসন্তপুরে।
এই জায়গাদুটির কথা অনেক বছর আগে শুনেছিলাম ভাওয়াইয়া গানে-
'ওরে বসন্তপুরের নাল টমেটো
কোনামালির মাগুর মাছ
খায়া যান খায়া যান রে'
কোনামালির সুধীর দাস ও বসন্তপুরের রতন মন্ডল।প্রথমজন প্রান্তিক চাষি। দ্বিতীয়জন মুড়ি বিক্রি করেন হাটে হাটে।
গল্প করলাম অনেকটা সময়। তুলে দিয়ে এলাম আগামী ১০ দিনের জন্য সামান্য কিছু উপাদান।
তারপর পুন্ডিবাড়ি হয়ে বাড়ি ফিরলাম।
কতরকমের জীবন দেখি।
কত কিসিমের মানুষ দেখি।

৬।

নদী তীরবর্তী এলাকায় হানিফ চাচার বাড়ি। একসময় অনেক জমি ছিল তার। ১৯৬৮-র বন্যায় ২০ বিঘে জমি তোর্সার গর্ভে হারিয়ে গেছে। এখন দেড় বিঘে জমি আর সংক্ষিপ্ত ভিটে তার সম্বল।হানিফ চাচার দুই মেয়ে।বিয়ে হয়ে গেছে।জামাইরা গাজিয়াবাদে থাকে। পরিযায়ী শ্রমিক।আটকে আছে এখনো। কোচবিহার শহরে একসময় রিকসা চালাতেন তিনি। আমি ক্লাস ৯ থেকেই হানিফ চাচাকে চিনি। পরবর্তীতে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।অনেক পুরোনো দিনের গল্প শোনার আগ্রহে তার প্রতি আমার আলাদা টান ছিল।হানিফ চাচা এখন ৭৪। ১২ বা ১৩ বছর আর রিকসা চালান না। মানে, শারীরিক কারণেই পারেন না। সামান্য সবজি চাষ, বাড়িতে পোষা গরুর দুধ বিক্রি আর জামাইদের সাহায্যে সংসার চালান। লগডাউনের পর থেকে প্রায় ৪৭ দিন ধরে আমি ওনার পরিবারের পাশে নিজের মতন করে আছি।
ইদের আগে গিয়েছিলাম হানিফ চাচার বাড়ি। এখন রমজান মাস চলছে। চাচা ও চাচী রোজায় আছেন।
আমাকে দেখে মুখে স্বর্গীয় হাসি। টুল পেতে দিতে দিতে বললেন-
'বইস বাপ। বইস। আরাম করি বইস'।
কি অদ্ভুত আন্তরিকতা তার কণ্ঠে।
সামনে খুশির ঈদ। চাচার হাতে তুলে দিলাম লুঙ্গি ও ফতুয়া।আর চাচীর জন্য একটা শাড়ি। সামান্য কিছু নগদও।
কথা হলো। সাবধানে থাকতে বললেন আমাকে।
হানিফ চাচাদের মতন মানুষরাই তো আমাদের শেকড়বাকর। এইসব সোনার বরণ ভুমিলগ্ন মানুষদের ভেতর কোন কৃত্রিমতা নেই। ভান নেই।

ভালো থাকবেন, হানিফ চাচা...

৭।

রাহুল, কৃষ্ণা, ইমন, দীপক, বিকাশ, মিঠুন, কৌশিক, রিপুঞ্জয়, জয়ন্ত, অশোক। সদ্য তরুনের দল। এদের কাজ ঘরের খেয়ে বনের মোশ তাড়ানো। মধ্যরাত থেকে ভোরবেলা, তপ্ত দুপুর থেকে গোধূলি। হাসপাতাল, রক্তদান, শ্মশান, ডাক্তারের চেম্বার-যেখানে ডাকা যাবে সেখানেই এদের পাওয়া যাবে। এরাই আমার তরুণ ব্রিগেড। আমার অহংকার।আমার ভরসার জায়গা।যেমন, একদিন রাতে ৫০ জনকে রাতের খাবার দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।আর আমার বাসায় এই তরুণ ব্রিগেড শুরু করে দিয়েছে রান্নার কাজ।তারপর এরাই বয়ে নিয়ে যাবে খাবার।বিতরণও করবে

গদ্য সুবীর সরকার

এরাই।
এক কাপ চা-ও তো খাওয়াতে পারি না রে তোদের। তারপরেও আমার পাশে থাকিস তোরা। সত্যিই, গর্ব হয়।

৮।
এক সন্ধেবেলায় একটা ফোন এলো। অসহায় মানুষের কথা শুনলাম। চলে গেলাম দুই তরুণ বন্ধুকে নিয়ে। মধুপুর এলাকায়।আকবর আলী ও নন্দ বর্মনের বাসায়। উঠোনে শুয়ে আছে কুকুর।পোষা কুকুর। বাচ্চার ওষুধ নেই। ঘরে চাল নেই।আলু, তেল নেই। হাতে নেই টাকা নগদ। লগডাউন বাড়ছে শুনে রীতিমত আতঙ্কিত তারা।
আগামী এক মাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পৌঁছে দিয়ে এলাম তাদের কাছে। একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে।
কিন্তু ভুলতে পারছি না চোখের জল।
সঙ্গে আছি। ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পদ মানুযের জন্যই খরচ করবো আমি।এবং মানুষই জিতবে।

৯।
মানুষের বিপন্নতার কোন অনুবাদ হয় না। অসহায় মানুষ দিন অনি দিন খাওয়া মাটির মানুষের মতন খাঁটি মানুষ খুব দূর থেকেই কেবল দেখে যায় ত্রাণশিবিরের আলো।
আমি মানুষের ভেতর ঘুরি। মহল্লা বস্তি বসতি নদীর চরের জনজীবনের ভেতর। খুব কাছ থেকে দেখি আকলিমা বিবি রওশন বেওয়া নন্দ দাস হামিদুল চাচা পুলিন বর্মণ রাধাকান্ত ঘোষ চতুর্ভুজ যাদব মহাদেবী মিশ্র-দেরকে। খুব বিপন্নতা বহন করতে থাকা বাতাসে উড়ে বেড়ায় মানুষের লবন হারিয়ে ফেলা চোখের জল। উত্তরহীন এক সময়ের আলেখ্য রচিত হতে থাকে বুঝি এভাবেই। এই অন্ধকার সময়ই তো আবার চিনিয়ে দেয় মানুষকে। মানবতাকে।কত কত মানুষ এই সংকটকালে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়াচ্ছেন। সব শ্রেণীর মানুষ। ভালো লাগে। ভরসা পাই।

এই আলো বুঝিয়ে দেয় ভালো কখনো হারাবে না। ভালো কখনো হারায় না। সকল সংকটকে পরাজিত করে শেষ হাসিটা মানুষই হাসবে। 'আবার নদীর জলে নেমে পড়বেন বাচ্চা হাতির মাহুত সাঁকোর ওপর বৃষ্টি। দাওয়ায় বসে মুড়ি ভাজবেন হামিদা বানু আমরা কুর্নিশ ছুঁড়ে দেব মানুষের দিকেই পকেট থেকে চিরুনি বের করে আনবেন সার্কাসের জোকার হাওয়া ও রোদের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে মাহুত বন্ধুর গান'।

১০।
এই অন্ধকার ও বিপন্ন সময়ে কত মানুষ কতরকমভাবে কাজ করছেন।ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ভাবে।প্রান্তিক ও দিন আনি দিন খাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তারা। আমাদের তরুন প্রজন্ম আমাদের অহংকার।তাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ খুব ভরসা জোগায়।
পারমিতা চোধুরী ও অর্চিষ্মান বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই দুজন ঝকঝকে তরুণ। অর্চি প্রিয় ভাই আমার। ভালো লোকসংগীত গায়। আর পারমিতার সাথে পরিচয় কবি মিতুল দত্তের মাধ্যমে। আজ ওরা এলো। সামাজিক কাজ নিয়ে কিছু কথা হলো, মানুষের অসহায় মুখগুলি বুঝি পড়তে শুরু করলাম আমরা। ওদের কাজের শরিক তো আমিও। সামান্য অনুদান তুলে দিলাম। শেষে অর্চিষ্মান তার দরদী গলায় শোনালো শাহ আবদুল করিমের তিনটি অসামান্য লোকগান। মানুষ হারবে না কারণ পারমিতারা আছেন।

উপসংহারের বদলে
এই অতিমারি। এই মহামারি। এই করোনার অন্ধকার ও বিপন্ন সময়ে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম। ছুটে গেছি গ্রাম ও গ্রামান্তরে।সোনার বরণ সব মানুষের কাছে। নানান অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমার সেই জার্নি। সেসবের কয়েকটুকরো দিয়ে সাজিয়ে দিলাম এই গদ্য, যার শুরু ও শেষ জুড়ে কেবল অন্তহীন মানুষের ঢল।

****

গদ্য

বিষণ্ণ ছোটবেলা

~ ডা: সোমা মৈত্র

মাত্র কিছুদিন আগের কথা করোনা তখনো আসেনি, পৃথিবীর নির্মল বাতাসকে বিষাক্ত করেনি। জীবনযাপন চলছিল তার নিজস্ব গতিতে মানসিক ব্যবধান ছিল অনেক কিন্তু মেলামেশায় কোন বাধা ছিলো না। এখন পৃথিবীর নতুন অসুখ করেছে। জানা অজানা আশঙ্কা, নিরাপত্তাহীনতা বোধ এমনকি মৃত্যু ভয়ও। অথচ আগে ছিলনা ট্রেস, বিষাদ, ভীতি, অবসাদ ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু, ছিলো অবশ্যই। ছোটোদেরও এসব থেকে রেহাই ছিল না, এখনো নেই।

হঠাৎ দেখা হয়েছিল শালিনীর সাথে, সঙ্গে ছিল ওর ছেলে ঋভু। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সিক্সে পড়ে ঋভু। শালিনীর নানা কথার মাঝে ওর ট্রেনশন বা ট্রেসের নমুনা দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম। কেমন আছিস জানতে চাওয়াতে বলল ভালো থাকার উপায় আছে? নতুন ক্লাসে উঠেছে ঋভু কী যে পড়ার চাপ! অঙ্ক, সায়েন্স সাবজেক্টগুলো এমনিতেই কঠিন তার মধ্যে এবার থেকে সায়েন্সের তিনটি ভাগ হয়ে গেছে। তিনটি আলাদা আলাদা বই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ভাবতো একবার। বাংলা, ইতিহাস এই বিষয়গুলি এমনিতেই কঠিন। এগুলো বলবার সময় শালিনী একবারও ভাবলো না এই কথাগুলো ঋভুর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আমরা ভুলে যাই আমাদের শিশুরা আমাদের কথা মন দিয়ে শোনে। মায়ের বলা কথাগুলি অঙ্ক, সায়েন্স খুব কঠিন, সায়েন্সের এতগুলো বই এইগুলো ঋভুর মনে পড়াশোনা নিয়ে এক অদ্ভুত ধারনার সৃষ্টি করে, তার মনে হতে শুরু করে সত্যিই আমার পড়ার কি চাপ, কত বই ইত্যাদি ইত্যাদি। যে শিশুটি খেলতে অনায়াসে বড় বড় কবিতা, ইংরেজি বানান ইত্যাদি শিখে ফেলতো তার হঠাৎ করে পড়াশোনা বিষয়টা খুব কঠিন মনে হতে লাগে, এক অজানা আশঙ্কায় হতে থাকে শিশুটি, ক্রমে ক্রমে জন্ম নেয় না পারবার ভয়।

একটু গভীরভাবে ভাবলে আমরা এই অভিভাবকেরাই নেগেটিভ কথাগুলো ওদের সামনে সবসময় বলে থাকি। যেমন ও এখন উঁচু ক্লাসে উঠেছে পড়ার খুব চাপ, অঙ্ক, ইংরেজি বিষয়গুলি খুব কঠিন, রোজ কত কত হোমওয়ার্ক করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাগুলি শুনতে শুনতে ওদের মনে পড়াশোনা সম্পর্কে এক নেগেটিভ ধারণা তৈরি হতে শুরু হয়, পড়াশোনা নিয়ে ভীতি তৈরি হতে শুরু হয় শিশুটির মনে। ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে পড়াশোনার উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে। অথচ আশঙ্কা ও ভয়ের বীজটি বপণ হয়ে যায় অভিভাবকদের কথোপকথনে - আলোচনায় অজান্তে নিঃশব্দে।

আমরা, মা বাবা এবং অভিভাবকেরা আমাদের সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে খুব চিন্তা করি, ভাবি খুব কঠিন ওরা কি পারবে! আসলে বিষয়গুলি একটুও কঠিন নয়, আমরাই 'কঠিন' শব্দটি ওদের মনে ঢুকিয়ে দিই। আমরা ওদের ওপর ভরসা রাখতে পারি না, ভাবি ওরা পারবে না। আসলে আগ্রহ জাগাতে পারলে কোন বিষয়ই কোন কাজই শিশুদের কাছে কঠিন না। সমস্যা সৃষ্টি করি আমরা। সমস্যা আমাদের অ্যাপ্রোচে। আমাদের অ্যাপ্রোচ সবসময় নেগেটিভ। আমাদের সন্তান যখন স্কুলে যায় এক গাদা 'না' এর বোঝা ওদের ওপর চাপিয়ে দিই, যেমন দৌড়াদৌড়ি করবে না, মারপিট করবে না ইত্যাদি। এরকম হাজারটা 'না' এর সামনে শিশুটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা কখনো বুঝিয়ে বলি না যখন খেলার সময় অথবা টিফিনের সময় দৌড়াদৌড়ি করবে, কারণ তখনই খেলার সময়। টিচার যখন পড়াবে তখন কথা বলবে না কারণ উনার পড়াতে অসুবিধা হবে। বুঝিয়ে বললে ওরা কিন্তু বোঝে শোনেও।

আজকাল সব অভিভাবকরা চান তার সন্তান কোন দিকেই যেন পিছিয়ে না পরে তাই একটু বড় হলেই পড়াশোনা সাথে সাথে গান, নাচ, কবিতা, খেলা, কম্পিউটার ইত্যাদি সবকিছুতে পারদর্শী করে তোলার জন্য শিশুটিকে ভরতি করে দেওয়া হয় এসব শেখার ক্লাসে, ফলে অতিরিক্ত চাপে পরে অ্যাংজাইটির শিকার হয় শিশুটি। আমার বান্ধবী তানিয়ার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন খেলা তার সবচাইতে প্রিয় সে বলেছিল আন্টি আমার খেলার সময় কই আমি যে ছ - ছটা স্কুলে পড়ি। পড়ার স্কুল, গানের স্কুল, নাচের স্কুল, কবিতার স্কুল, আঁকার স্কুল, আবৃত্তির স্কুল।

সত্যি আজ আমাদের সন্তানদের খেলার সময় নেই কারণ তাকে তৈরি হয়ে উঠতে হবে মা - বাবার চাহিদা অনুযায়ী, হয়ে উঠতে হবে সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। মা - বাবা তাদের অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চান সন্তানের মধ্য দিয়ে, তাদের স্কুলের পর যেতে হয় বিভিন্ন টিউশন ক্লাসে। যন্ত্রের মতো বিভিন্ন টিউশন সিডিউল মেনে চলতে চলতে হারিয়ে ফেলে শৈশব, হারিয়ে যায় কল্পনা, হারিয়ে যায় খেলার আনন্দ। এছাড়া প্রতিটি মা-বাবা চান তার সন্তান যেন সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করে।

অনেকক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় কতটা ভালো তার ওপর নির্ভর করে মা - বাবার সামাজিক পরিচিত, সম্মান। ফলে পড়াশোনায় ভালো ফল করতেই হবে এরকম মানসিক চাপ তাদের

গদ্য ডা: সোমা মৈত্র

ওপর থেকেই যায়, ফলস্বরূপ প্রচুর সংখ্যক ছেলেমেয়েরা আজ হয়ে পরছে বিষাদগ্রস্ত। মা - বাবার নিজেদের সাধ আর সন্তানদের সাধ্যের মধ্যে ফারাকটা বুঝতে পারেন না, তাই পড়াশোনা যেন তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পড়ায় যে যে আনন্দ সেটাই হারিয়ে ফেলে। পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলার অনেকগুলো কারণের মধ্যে আরো একটি অন্যতম কারণ হল অভিভাবকদের উৎসাহদানের অক্ষমতা। আমাদের মনে রাখতে হবে সন্তানদের সুষ্ঠু ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ যেন আমরা সৃষ্টি করতে পারি।

কি করবেন অভিভাবকেরা:

১। ভালো কাজের প্রশংসা করতে হবে।

২। ওদের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩। বন্ধুর মতো মিশতে হবে। ওদের বুঝতে হলে ওদের লেভেলে নেমে এসে ভাবের আদান-প্রদান করতে হবে।

৪। একসাথে কোয়ালিটি টাইম কাটাতে হবে যেমন গল্প করা, বেড়ানো, বই পড়া,খেলা, টিভি দেখা ইত্যাদি।

৫। ওদের নিজের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগ দিতে হবে অর্থাৎ এন্টারটেইনমেন্টের জন্য সময় দিতে হবে যেমন টিভি দেখা, ভিডিও গেম খেলা, গল্পের বই পড়া ইত্যাদি যার যেটা ভালো লাগে।

৬। যে কোন খেলা যেমন ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট অথবা ফুটবল, যোগা অর্থাৎ ফিজিক্যাল অ্যাকটিভিটিতে যাতে যোগদান করে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৭। স্কুল বা খেলার মাঠ থেকে ফিরে এলে সারাদিন কি কি করল সে সম্পর্কে গল্প করা এবং গল্পের মাধ্যমে তার সারাদিনের অ্যাকটিভিটি জেনে নেওয়া। কিন্তু প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা যাবে না।

কি করবেন না অভিভাবকেরা:

১। পড়াশোনা সংক্রান্ত কোন নেগেটিভ বিষয় ওদের সামনে আলোচনা করে করে অজানা আশঙ্কা ধরিয়ে দেবেন না।

২। ও পারবে না, ওর অঙ্কে মাথা নেই, ইংরেজি বোঝে না, বাংলায় খুব কাঁচা, ওর কিছু মনে থাকে না, পরীক্ষার খাতায় ভুল করে ইত্যাদি নেগেটিভ কমেন্ট করবেন না।

৩। হোমওয়ার্ক বেশি থাকলেও তা নিয়ে ওদের সামনে আলোচনা করবেন না, বলবেন ও ঠিক করে ফেলবে।

৪। কারো সঙ্গে তুলনা করবেন না যত খারাপ ফল করুক না কেন।

৫। নতুন ক্লাসে উঠলে অথবা নতুন স্কুলে ভর্তি হলে কোন নেগেটিভ আলোচনা ওদের সামনে করবেন না যেমন কত সকালে উঠতে হবে, নতুন স্কুল কত পড়ার চাপ, কত বই ইত্যাদি।

৬। নিজে ওর বয়সে কি করেছেন, এখন ওর জন্য কি করছেন এসব বলবেন না।

******

গদ্য

অসুখের দিনগুলো এবং কিছু ভাবনা

~ শুভময় সরকার

সেটা এক সময়ের গল্প। তখনো এত উল্লাসময় জীবনের গল্প শুরু হয়নি। উল্লাস ছিল না বটে, তবে ছিল আনন্দ! দুঃখ কি তবে ছিল না? সেও ছিল তবে আনন্দের সঙ্গে মিলে মিশে সে এক সম্পূর্ণ জীবনের গল্প। নিরন্তর বহে চলা এক আপাত স্রোতের আড়ালে যে অন্য এক স্রোত, সে স্রোতের খোঁজও ছিল সে জীবনে। সেই ছুঁয়ে থাকা স্রোতের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে থাকতে গিয়ে জীবন হয়ে যেত যেনো এক আখ্যান। সে আখ্যানে আজকের পর আগামীকাল,তারপর আরও একটা আগামীকাল এবং সেই আগামীকালের পরও আরও এক সুদীর্ঘ সময়ের জন্য থাকতো অনন্ত অপেক্ষা! তবে কি সময়ের কোনো অসুখ ছিল না? নাকি গোপনে গেরিলার মতো বেড়ে উঠছিল যে অসুখ, তা আমরা অনুভবই করিনি! না কি অনুভব করতে চাইনি!

ভাবনার কিছু অনুষঙ্গ জরুরি, নইলে ভাবনা এগোয় না, চেতনাপ্রবাহে ছবি ভেসে না উঠলে সময়কে, সময়ের অসুখকে ধরা দুঃসাধ্য! এ লেখায় ভাবনার পশ্চাদভূমি হিসেবে কাজ করে একটা সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাস এবং পথচলা যা গড়ে উঠেছিল পর পর কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে। আজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সবই সময়ের জলছবি। রাত বাড়লে গভীর এক সময়ের মুখোমুখি হই আমি আর অনুভব করি, সময় আবার গর্ভবতী হচ্ছে! চিহ্নগুলো ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। আমরা অনুভব করছি কিংবা করতে পারছি না!

সে এক বসন্তবিকেলের গল্প। ছাত্রজীবনের প্রায় শেষ পর্যায়, 'বাইরে তখন বক্ষে বৃক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে' বসন্তের উদাসী হাওয়া। হাংরি লেখক ফাল্গুনী রায়ের সেই বিখ্যাত বইয়ের শিরোনাম মনে রেখে (বইটির নাম – 'আমার রাইফেল, আমার বাইবেল') বলতে হয় – আমার রাইফেল এবং বাইবেল দুটোই তখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস! তো সেইসব উড়ু উড়ু বিকেলে শহর গেলে বিশ্ববিদ্যলয়ের বাসেই ফিরি ক্যাম্পাসে। শহর এবং ক্যাম্পাসের মাঝে তখন সেই বিখ্যাত সবুজ চা-বাগান,যা দেখে প্রতিনিয়ত মুগ্ধতা আমাদের। চোখের সামনে দৃশ্যগুলো যেনো প্রতিনিয়ত ডানা মেলে আজও আমার নিভৃত যাপনে। শহর ছাড়ার পরই শুরু হতো সেই গ্রীণকার্পেটের চা-বাগান। দূরে যেতে যেতে বাগানটা যেনো মিশে ছিল পাহাড়ের সঙ্গে। আর আমরা বুক ভরে টেনে নিতাম বিস্তর অক্সিজেন। সেই অক্সিজেনের জোরেই বোধহয় এখনো সজীব সতেজ লাগে সবকিছু। সেই সবুজ কার্পেটের ওপর দিয়ে পাহাড়ের রহস্যময়তা দেখার নেশা আজও আছে কিন্তু সে পাহাড় আর ওভাবে দেখা যায়না, চা-বাগানের সবুজ কার্পেটের অনুষঙ্গটাই গেছে হারিয়ে,মুছে দেওয়া হয়েছে সব চিহ্ন।

পৃথিবীর অসুখ তো শুরু সেই মানবসভ্যতার অগ্রগতির সময় থেকেই। সময় যতো এগিয়েছে, সে অসুখের গভীরতাও বেড়েছে! অনিবার্যভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে অসুখ! আমরা হয়তো অনুভব করেছি কিন্তু উন্নয়নের অমোঘ টানে বুঝেও বুঝতে চাইনি সেই অসুখ! আসলে এই উন্নয়ন কথাটাই যে বড় বিতর্ক তৈরি করে দেয় আমাদের মনে। কাকে বলবো উন্নয়ন, কাকে বলবো সভ্যতার অগ্রগতি!যাক এসব প্রশ্নের উত্তর তাত্ত্বিকভাবে না খুঁজে বরং খুঁজে নেওয়া যাক ব্যক্তিগত অনুভবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। তো সেই অভিজ্ঞতার অনুভবেই বরং ফিরে আসি চাঁদমনি-চা-বাগানের প্রসঙ্গে! ক্যাম্পাস জীবনে থাকাকালীনই চারপাশে এক ফিসফাস, উন্নয়ন উন্নয়ন গন্ধ পাচ্ছিলাম,বুঝতে পারছিলাম গন্ধটা সন্দেহজনক । আমার চোখের সামনে পরিচিত সব দৃশ্যগুলো ততোদিনে ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করেছে। এক লেন তখনো চার বা ছয় হয়নি তবে চওড়া হতে শুরু করেছে সেসময় । কাটা পড়ছিল দুপাশের সবুজ। নয়ের দশকের শুরুতেই 'বিশ্বায়ন' শব্দটা অজান্তেই আমাদের প্রাত্যহিক ভোকাবুলারিতে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে, সাদা-কালো টিভির রঙিনে বদলে যাওয়ার থেকেও দ্রুততায় রঙিন হতে শুরু করেছে চারপাশ! নেশার মতো ঘোর লাগছে চোখে, পাঁজরে দাঁড়ের শব্দগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে, প্রকট হচ্ছে উন্নয়নের ক্যাকোফনি। ততোদিনে ক্যাম্পাস জীবন শেষ করে ভিন্ন এক আঙিনায় পা রেখেছি। একদিন এক

সকালে গুলি চললো সেই সবুজ চা-বাগানে। দুই পক্ষেরই প্রস্তুতি হয়তো ছিল। তুমুল লড়াই এবং ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো সেই সবুজ। পড়ে রইলো কিছু রক্তের ফোঁটা। তারপর এবং তারও পর কিছু গাঢ় শব্দহীন সময়। পরিকল্পিত বিরতির পর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এক উপনগরী, কর্পোরেট হাসপাতাল, বিলাসবহুল আবাসন। এল-ই-ডি ঝলমলে রঙিন উচ্ছ্বাসে আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের কুল কুল পরিবেশে 'শপিং' করতে করতে আমরা একদিন ভুলে গেলাম সেই সবুজ কার্পেটের স্মৃতি! ভুলে গেলাম সেই মাটিতে পড়ে থাকা রক্তবিন্দুর কথা! পৃথিবীর অসুখ গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করল আবার। আমরা মেতে রইলাম ফূর্তিতে, 'মস্তিতে'।

রাত বাড়ে, আমার নিভৃতযাপনে ফিরে ফিরে আসে সময় আর সেই

গদ্য শুভময় সরকার

সময় থেকে সময়ান্তরের আশ্চর্যভ্রমণে ভেসে ওঠে অসংখ্য টুকরো টুকরো জলছবি! আজকের এইসব গভীর থেকে গভীরতর অসুখের সময় হাঁটতে হাঁটতে রক্তাক্ত হচ্ছে পা, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে হৃদয়, আমরা ক্লান্ত হচ্ছি। সেইসব টুকরো টুকরো জলছবির আরও একটির কথা মনে পড়ে এই নিভৃত যাপনের দিনগুলিতেই। বাতাসে তখন রোমান্টিকতার দোলা, কলেজ ক্যাম্পাসের সোনালি রোদ আর অবিরাম বারিধারায় ভেসে যাচ্ছে আমাদের অদ্ভুত বাউন্ডুলে জীবন। সপ্তাহান্তে একেকদিনই দল বেঁধে কজনে মিলেই হারিয়ে যেতাম ডুয়ার্সের ঘন সবুজে। কখনো তা চা-বাগানের মধ্যে, কখনো বা গভীর অরণ্যে! আমাদের সেইসব যাপনচিত্রের মাঝে কত কত দৃশ্য যে চোখে পড়ত, দেখতাম চা-বাগানের তুমুল উত্তেজনার ফুটবল ম্যাচ, এ-বাগান বনাম ও-বাগান,আবিষ্কার করতাম সবুজ গালিচার মাঝে বাগানের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব জগত, সেখানে যে ক্রাইসিস ছিলনা, তা নয় কিন্তু ক্রাইসিসের মাঝেও ছিল এক অদ্ভুত প্রাণের আনন্দ...!

সাপ্তাহিক গ্রামীণ হাটে দলবেঁধে ছুটতো বাগানের মানুষজন। পুজোর আগে বোনাসের পর এক চা-শ্রমিককে দেখেছিলাম মালবাজারের রাস্তায় মেয়েকে নিয়ে বাজার করে ফিরতে, আর মাথায় লাল ফিতে বাঁধা সেই বাচ্চা মেয়েটি লাফাতে লাফাতে চলেছে বাবার হাত ধরে। সে এক অদ্ভুত আনন্দের দৃশ্য। পুজোর সময় নীল আকাশের নীচে সবুজ চা-বাগানগুলোতে ঢাকের বোলে মেতে ওঠার সময় সেটা। সমরেশ মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা’, ‘কালপুরুষ’-এর হ্যাংওভারে আমরা তখন আচ্ছন্ন।

কারণে অকারণে সবাই তখন নিজেকে অনিমেষ ভাবা শুরু করেছি। এখন এসব ভাবলে হাসি পায় কিন্তু সেই সময় ওটাই ছিল সত্যি। তো সেই সব দিনে ডুয়ার্স বেড়ানোর জন্য চলে যেতাম নানান জায়গায়। সেই সব স্মৃতি আজও ঝাপসা নয়, বরং ভীষণ রকম স্পষ্ট। চালসা থেকে নাগরাকাটা যাবার রাস্তায় আজও আমি মানসভ্রমণ করি...! রাজাভাতখাওয়া রেলস্টেশনের নির্জনতাকে এই এতকাল পরও রাত বিরেতের আশ্চর্যভ্রমণে ছুঁয়ে ফেলি। আমি সেই আশ্চর্যভ্রমণে দুরন্ত গতির বাসে ছুটে যাই জঙ্গল আর চা-বাগান চিরে চলে যাওয়া কালো ফিতের মতো রাস্তা দিয়ে আর যেতে যেতে দেখে ফেলি কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার ছায়ায় ঘেরা কাঠের বাড়ি, খেলার মাঠ, প্রাগৈতিহাসিক সিনেমাহল! আসলে এই অনুভূতিগুলো ঠিক লিখে বোঝানো যাবেনা। এ এক নিবিড় অনুভবের ব্যাপার। আর এ অনুভূতি গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই।

আটের দশকে শেষ কিংবা নয়ের দশকের শুরু থেকেই কিন্তু ডুয়ার্স, চা-বাগান অঞ্চলগুলোর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল। ঝলমলে সবুজ বাগানগুলো জরাজীর্ণ হওয়া শুরু করল পরিচর্যার অভাবে, বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিলছিল না ওষুধ। চিকিৎসক নেই, কুলিলাইনে নিত্যনতুন কান্নার রোল, ঝাঁ চকচকে অভিজাত ম্যানেজারস বাংলোর সেই জৌলুসও রইল না আর। কোথায় যেনো ছন্দটা গেল ভেঙে । বুধুয়া,শুকরা, রাইমণিরা শহুরে বাবুদের কাছে আর ট্রেড ইউনিয়ন বুঝতে চাইছিল না। চা-বাগানের এই সব বদলে যাওয়া ছবিগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, ডুয়ার্স এর বাগান কিংবা শিলিগুড়ি লাগোয়া চাঁদমণি, সবগুলোই একই ক্রাইসিসের সুতোয় বাঁধা। আসলে তার আগের কয়েক দশকে সবার অজান্তেই, অলক্ষ্যেই টি-প্ল্যান্টার্সদের হাত থেকে বাগানগুলো চলে গেছে টি-মার্চেন্টসদের হাতে।বাগানকে, গাছকে ভালোবাসার বদলে কেবল মুনাফার সন্ধান শুরু হয়ে গেছে ততোদিনে।ক্রাইসিস যখন বেড়েছে, অসুখ ততোদিনে অনেক গভীরে!

আমার সেই আশ্চর্যভ্রমণে মাঝে মাঝে আমি ছুটে যাই লাটাগুড়ি জংগলের বুক চিরে। সবুজ অরণ্যে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই, প্রাণভরে বাঁচি কিন্তু অসুখের প্রকোপ যে কতোটা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র, সেটা অনুভব করে ফেলি দ্রুত। ছন্দ কেটে যায়, নষ্ট হয়ে যায় আমার সেই আশ্চর্য ভ্রমণ যখন বুঝতে পারি ইকোট্যুরিজমের প্রকৃত স্বরূপ, খবর পাই রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার গাছের শব পড়ে আছে ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য! কেন নির্মিত হবে সে ফ্লাইওভার? কারণ লেভেল ক্রশিংয়ে নাকি যানজট হয়! কোন রেলপথ সেটা, কেমন ব্যস্ততা তার? না, সারাদিনে সাকুল্যে একটি ট্রেন যায়, একটি আসে, সকাল-সন্ধ্যায়! অনুভব করি গভীর হচ্ছে পৃথিবীর অসুখ! পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরতর অসুখ এখন। উন্নয়ন নামক ইউটোপিয়ায় আক্রান্ত মানুষ নিজের অজান্তেই কবে কখন ভোগবাদের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি। ঝাঁ চকচকে রঙিন জীবনের মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে প্রকৃতি-সান্নিধ্য থেকে দূরে, বহুদূরে পৌঁছে গেছে মানুষ। পিছু হঠেছে জঙ্গল, গলছে মেরু-বরফ, ইকোট্যুরিজিমের নামে পড়ছে গাছেদের লাশ। বন্যপ্রাণী, পাখি তার নিজস্ব এলাকা ছেড়ে পেছতে পেছতে প্রান্তিক হয়ে গেছে আর নিরন্তর বেড়ে চলেছে মানুষের ক্রাইসিস-শারিরীক এবং মানসিক!

পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরতর অসুখ এখন! এই দমবন্ধ সময়ে ফিরে আসছে ভাবনা, মানুষ হয়তো বা বুঝতে পারছে তার ভুলগুলো! হয়তো বলছি কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত নই, তবু মনে হয় মানুষই একদিন শুধরে নেবে নিজেকে। গভীর গভীরতর অসুখ থেকে মানুষই পারে বেরিয়ে আসতে, মানুষই পারে

গদ্য শুভময় সরকার

ঘুরে দাঁড়াতে! মানুষই পারে বলে উঠতে – 'আহ বেঁচে থাকাটা নেহাত মন্দ নয়! প্রকৃতি নিজেকে ঠিক সামলে নেবে, সব বিষ ঝেড়ে আবার সজীব সতেজ হয়ে উঠবে, কিন্তু মানুষ পারবে কি? বিশ্বাস রাখি পারবে, কারণ মানুষই পারে ভালোবাসতে! আবার নতুন করে বাঁচতে, বলে উঠতে – মোরে আরও আরও আরও দাও প্রাণ...!

ওদের স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন ওদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করি তাহলে আমরা আমাদের সন্তানদের সুস্থ, স্বাভাবিক এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারব যা আমাদের স্বপ্ন।

****

মুক্তগদ্য

আয়ু

~ শুভম তুহিন

বেমালুম সেদিন স্লেট পেন্সিল নিয়ে অ আ ক খ লিখতে বসেছে পরিমল।পরিমল আমার পাশের বাড়ির নারান খুড়োর নাতি।

ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের মনসা মেলার ধার ঘেঁষে।গোটা কয়েক শিশু তাদের মা ঠাকুরমার মাথার ঝরে পড়া চুল নিয়ে ফেরিওয়ালার সাইকেলের পেছনে দৌড়াচ্ছে। ফেরিওয়ালা চুল দিলেই সনপাপড়ি দেয়।

দুটো বেদে কালীমেলার আটচালার উপর সাপ খেলা দেখাচ্ছে। ছোট বাটিতে চাল আলু আর এক দু টাকা নিয়ে ভীড় করে আছে লোকজন। দুটো সাদা গোখরা ফনা তুলে বেদের হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে আছে।এই সব নানা কারণে চিরকাল খিদেকে মৃত্যুর চেয়ে বড় বলে জেনে এসেছি।

এসব বহুকিছু গল্পের ভার বইতে বইতে কয়েক ক্রোশ দূরে চলে গেছি আমি। মফস্বলে এসব গল্পের সংগ্রহশালা নেই। আদিকালের যেকটা মানুষ ছিল, ওপারে তারা ভাগ বসাতে গেছে।যে কটা বেঁচে আছে, তাদের গল্প শোনার শ্রোতা নেই।

মানুষের মতোই গল্পদেরও আয়ু থাকে। স্লেট পেন্সিলে লেখা অ আ ক খ এর মতোই তারাও একদিন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পাহাড়ের কোনো দুর্গম গুহায় লুকিয়ে থাকে।

গন্তব্যহীন

~ যাজ্ঞসেনী

পৃথিবীর গভীর অসুখ বলে বারান্দার গ্রিলে বেঁধে রাখি ব্যক্তিগত অ-সুখ। ক্ষীণস্রোতা সমুদ্রে ভেসে যায় শূন্য জাহাজ। জলের স্বরনেই, দিক চক্রবাল নেই, মাস্তুল – নাবিক কিছুই নেই। নিশ্চুপ পৃথিবীর আনাচকানাচে কান পাতি। যে বাতাস কিছুদিন আগেও উড়িয়েছে খোলা আঁচলের মতো সাদা পাল, শুনিয়েছে চমৎকার চন্দ্র- সঙ্গীত, ভাসিয়েছে খোলাচুলের মতো মেঘ হয়ে যাওয়া ভালোবাসা, সে এখন চারদেওয়ালের অন্তরালে গভীর দুটি বৃত্ত থেকে নিঃশ্বাস ফেলে। যে আকাশ চুপিসারে দেখেছে বৃষ্টি মাখা রাস্তা বরাবর হাতে হাত হেঁটে যাওয়া লিপস্টিক - সিগারেট, সে এখন আনমনে কাকে যেন বলে, সুখ নেই। সুখ নেই কোমোটে! পৃথিবীর গভীর অসুখ বলে দৃষ্টি চেয়ে থাকে গুটিয়ে আসা রাজপথের দিকে।

কারা যেন হেঁটে যায় হাহাকারের মতো, কারা যেন বুভুক্ষু হাত বাড়ায় নতজানু হয়ে, কারা যেন ফেরিওলার মতো হাঁক পাড়ে, অসুখ নেবে অসুখ?

পৃথিবীর গভীর গহীন গন্তব্যহীন অসুখ বলে, বারান্দার গ্রিলে বেঁধে রাখি ব্যক্তিগত অ-সুখ সমগ্র।

গল্প

জিয়নকাঠি

~ গীর্বাণী চক্রবর্তী

পটলা আর পটলার মা নীতু অত্যাধুনিক বাড়িটার বিশাল কাঠের দরজাটার ভেতরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিক থেকে বাড়ির গিন্নীর কর্কশ চিৎকার ভেসে আসে, কিরে নীতু মাস পড়তে না পড়তেই চলে আসতে হল টাকা নিতে! কোন কান্ডজ্ঞান নেই তোদের! দরজা খোলা পেয়েছিস ওমনি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লি।

ঠিকে ঝি নীতু এই কিছুদিন আগে ওকাজের বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ত। আর গিন্নীর চেহারাটা ওকে দেখেই বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।আর এখন......! মিনমিন করে নীতু বলে, আসলে দিদি বেতনটার জন্য আসলাম। পটলার বাবা কবে ফিরবে জানি না। তাই ...।

গলা খাঁকরে ঘামে ভেজা জ্যাবজ্যাবে মুখটা মুছে গিন্নী বলে ওঠে, শুনলাম তো প্রচুর রেশন টেশন দিচ্ছে। তা ওখান থেকে আনিস না? আর তুই যেনা কেরড গায় আঁচলটা বেঁধে হুট করে ঢুকে পড়লি আমার বাড়িতে, এবার তো সারা রাস্তার ভাইরাস আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে। আর পারিনা বাপু।

নীতু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরটা তার বড় অস্থির লাগে। টাকাটা সত্যি খুব দরকার ওর। পটলা এতক্ষণ মা'র বকুনি খাওয়া দেখছিলো। এখন ওর চোখ যায় ওই বিশাল ঘরটার এককোনে যেখানে কাচের টেবিলের ওপরে রাখা নানারঙের প্লাস্টিকের ঝুড়িতে আম, লিচু, আপেল আরও কত ফল থরেথরে সাজানো সেদিকে। আর ওই টেবিলটার মাঝের চেয়ারটায় বসে পটলারই প্রায় সমবয়সী বছর দশেকের মোটাসোটা গোলগাল একটি ছেলে একগ্লাস দুধ তার সাথে ছোট ছোট বিস্কুটের মতন কি যেন খাচ্ছে। মাঝে মাঝেই পটলার নাকে ঝাপটা মারছে কষা মাংসের সুগন্ধ। পটলার মুখের ভেতরটা কেমন জলজল হয়ে ওঠে। পেটের ভেতরেও জ্বালাজ্বালা করে।

শোন নীতু এই দু'মাসের টাকাটা নিয়ে যা। জানিসই তো আমাদের ব্যবসাও এতদিন বন্ধ ছিল। যখন সবঠিক হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে। এখন যা তোরা.........খড়খড়ে গলায় কথাগুলো বলেই প্রায় তিনফুট দূর থেকে গিন্নী টাকাগুলো ছুড়ে মারে নীতুর দিকে।

পটলা দেখে মা'র ফর্সা মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। তবুও টাকা গুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কিছুটা কানিজের হাতে রেখে বাদবাকি টাকাটা ধীরে ধীরে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখে নীতু। তারপর মৃদুস্বরে বলে, মাসে যতদিন কাজ করেছি সেক'দিনের টাকাটা নিলাম। বাকি টাকাগুলো রেখে দিও। তোমাদের ব্যবসার কাজে লাগবে।

গিন্নীর আষাঢ়ের মেঘের মত কালো হয়ে আসা মুখটা বিস্ফোরণের আগেই পটলাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নীতু গেট পেরিয়ে রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়াগাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। পটলার মনে হয় মা'র মাথাটা উঁচু হতে হতে কৃষ্ণচূড়ার ফুলভর্তি ডালগুলিতে ঠেকে যাবে এখুনি। শিশু পটলা জানেনা রোগাক্রান্ত পৃথিবীতে সমাজটা ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শুধু ভালোবাসার ছোট্ট ছোট্ট মুহূর্তরা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ পটলা দেখে মা ওর গালটা ধরে বলছে, কিরে মাংস খাবি? চল তোকে বাড়িতে রেখে বাজার থেকে মাংস নিয়ে আসি।

পটলার গলার কাছে কান্নাটা অনেকক্ষণ ধরেই দলা পাকাচ্ছিলো। আর পারেনা সে। মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। তারপর কান্না ভেজা গলায় বলে, আমি কিছু খাবনা মা। আমার খিদে পায়না। শুধু তুমি আমার কাছে থাকো। কোথাও তুমি যাবে না।

নীতুর চোখের জলে পটলার মাথা ভিজে যেতে থাকে। আর তখনই মৃদুমৃদু বাতাসে লালকৃষ্ণচূড়া ফুলেরা টুপটাপ করে পটলা আর নীতুর মাথায় ঝরেপড়ে......ঝরে পড়তেই থাকে।

****

ছবি: সুভম মুখার্জী

গল্প

দ্য ওল্ড উওম্যান অ্যান্ড লকডাউন

~ ডাঃ শর্মিষ্ঠা দাস

ভোররাতে জানালায় সান্তিয়াগো বুড়োর মুখ যেন মনে হল। রীতা চমকে উঠলেন। ছোটবেলায় বাবার লাইব্রেরিতে বুড়োর সঙ্গে পরিচয়। কোন লড়াই আবার সামনে আসছে কে জানে।

রীটা মুখার্জি নামটা শুনলেই একসময়ে পুরুষ কেন আশেপাশে মেয়েদের মুখেও আলো জ্বলত। কোনো পার্টি, অনুষ্ঠানে গেলে -- দরজা পেরোলেই মৃদু গুঞ্জন কিছু কম্পন টের পাওয়া যেত। প্রসাধন যে তেমন করতেন তা নয়। গাঢ় মেরুন , বটল গ্রীন বা ম্যাজেন্টা রঙের ভারী সিল্ক। কানে একটা মুক্তোর টপ আর সরু পেন্ডেন্ট। কখনো দু এক কুচি হীরে। হালকা লিপস্টিক। ব্যক্তিত্ব একদিনে নয় ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে । বাবার কোম্পানির দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ল যখন মধ্য কুড়ি। কর্মচারীরা মানবে কিনা তা নিয়ে সংশয়। একটা ছদ্ম গাম্ভীর্য মুখে পাউডারের মতো মেখে নিতে হত। কতটা প্যাম্পারড চাইল্ড ছিলেন কাউকে বুঝতে দিলেন না বাবার অবর্তমানে।

বড় কোম্পানির মালিক, সমাজকর্মী-- অঢেল পয়সা আর ক্ষমতা। রোজই দুটো একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতে কাটা। এসব লোকে দেখেছে কিন্তু কি অমানুষিক পরিশ্রমে যে বিজনেস টিঁকিয়ে রাখতে হয়, তাকে বাড়াতে হয় সে গল্প পুরোনো ফাইলের ভাঁজে ভাঁজে আছে। বিয়ে করার কথাও ওইসব অর্ডার টেন্ডার পেমেন্ট ফাইলেই চাপা পড়ে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার। যে কোনো বড় সমস্যার আগেই জানালায় সান্তিয়াগো বুড়ো আসে। ফিসফিস করে বলে - "আর একটু আর একটু কষ্ট করো--একটা মাছের মতো অথবা একজন মানুষের মতো"।

পর্বত হোক বা জীবন বা পৃথিবী--শীর্ষ একটা বিন্দু মাত্র, সময় সে বিন্দু থেকে হড়কে পড়ে যায়। কোম্পানির রমরমা রইল যতদিন শরীরে কুলোল, মনে সাত সমুদ্রের বল। তারপর উত্তরাধিকারের মশাল কে আর হাতে নেবে। একে একে সব বিক্রি করে দিতে হল।

বাঁ হাতে টেনে হাত আয়নায় মুখ দেখলেন রীতা --চোখের পাশে গালে সময়ের অজস্র আঁচড়। যখন চলতে ফিরতে পারতেন, বন্ধুরা বলেছিল -- বটক্স নাও, সব চলে যাবে। বোকার দল সব -- ক্যামোফ্লেজে কি সময় চুরি করা যায় । মোবাইলে ঘড়ি দেখলেন -- নটা বেজে গেছে। সেকি! রমলা এখনো এলো না তো। রাতের আয়া নমিতা ভোর ছটায় চলে যায় । রমলা সাতটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এক ঘণ্টা একাই থাকেন । ব্রেন স্ট্রোকটা হবার পর ডানদিকটা প্রায় অকেজো । তবু মনের জোরে চলাফেরা করেন। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই রমলার ফোন -- "দিদি কাল রাতের খবর শোনোনি? সব লকডাউন । ট্রেন বাস কিচ্ছু চলছে না। যাব কি করে! একটা কিছু ব্যবস্থা করে নাও"।

টিভি খারাপ হয়ে আছে বেশ কিছু দিন ।বিশেষ দেখেন না বলে সারানোর তাড়াও নেই। এবার তো বেশ ঝামেলা হয়ে গেল। আয়া সেন্টারে ফোন করলেন । কেউ না কেউ তৈরীই থাকে ওখানে। ও বাবা। যে ছেলেটি সেন্টার চালায় সে-ই আসতে পারেনি। হঠাৎ নাকি রাত আটটায় নোটিশ দিয়ে রাত বারোটা থেকে পুরো দেশ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোভিড করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোখার জন্য। ঠিকে কাজের লোক, রাঁধুনি, ড্রাইভার সবার ফোন এল একে --কারো বাড়ি থেকে বেরোনোর উপায় নেই। জটিল আশঙ্কার ফণা দেখা গেল এবার। ডানদিক প্যারালিসিসের পর হাত পাগুলো যে আর নিজের বশে নেই। ঘন্টা খানেক ধরে ফোন করলেন অনেককে। সবাই এক কথা --সেকি। খবর শোনোনি। সবাই কে দরজা বন্ধ করে বাড়িতে থাকতে হবে এখন। কেউ ইচ্ছে থাকলেও কোনো সাহায্য করতে আসতে পারবে না । পেঙ্গুইন কেয়ারের নাম্বার দিল একজন। তাঁরা বলল--কাছে থাকার মতো লোক নেই এখন, তবে রান্না করা খাবার পৌঁছে দিতে পারবে কাল থেকে।

কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকলেন। অন্যদিন সুরমা এসে চা দেয়। খাট থেকে নামতে সাহায্য করে । হ্যান্ডিক্যাপড লাগে বলে ওয়াকার ব্যবহার করেন না। নীচে গ্রিপ দেওয়া ওয়াকিং স্টিকটা টেনে নিলেন। চোরের মতো সাবধানে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে গেলেন। এদিক সেদিক হাতড়ে গ্যাসলাইটার খুঁজে জ্বালিয়েও ফেলা গেল। আধা অকেজো লড়বড়ে পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে প্যানে জল চড়ালেন । চরম ব্যালেন্সের পরীক্ষা দিতে দিতে এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে সোফায় বসলেন--সান্তিয়াগো বুড়ো পিঠ চাপড়ে দিল -সাবাশ। জিত । কাপে সিপ দিতে গিয়ে দেখেন সেই মার্লিন মাছটা সাঁতার কাটছে । নাহে রীটা মুখার্জি তুমি এখনো বেঁচে আছো।

রমলা অতদূর থেকে ট্রেন না চললে কোনমতেই আসতে পারবে না। নমিতা বাড়িঘর ফেলেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে আগামীকাল এসে থাকবে। ভোঁতা নখ ভাঙা দাঁতের বাঘ—তবু, পুরোনো পরিচয়ে

গল্প ডাঃ শর্মিষ্ঠা দাস

থানায় ফোন করে নমিতার জন্য ভাড়া গাড়ীর ব্যবস্থা একটা করতে পারলেন। মনে মনে গজগজ --আরে বাবা, চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিবি না মানুষকে, দিনরাত কি সবাই টিভির সামনে বসে থাকে নাকি । সারাদিন ধরে দুনিয়ার যত আত্মীয় বন্ধুর ফোন। কেউ ভেলোরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকে গেলেন-হাতে টাকা নেই। ছোট বাচ্চা নিয়ে বিঁভুইতে মা একা --কত্তা অফিসের কাজে মুম্বইতে।

খিদে পাচ্ছে এবার । সুগারের ওষুধ সকালে খাওয়া হয় নি। এখন খেলেন। কোনোরকমে ওয়ান বোল চালডালের স্যুপ বানালেন। আবার সেই ব্যালেন্সের খেলা। এবার হার। গরম বাটি মেঝেতে পড়ে গেল দুর্বল হাত পিছলে। সুগারের ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে-- এক্ষুনি কিছু পেটে না পড়লে দুনিয়া ছাড়তে হবে। ঝিমঝিম করলেও মাথাটা এখনো কাজ করছে, এরপর করবে না। প্রায়

হামাগুড়ি দিয়ে কিচেনে ঢুকে বিস্কুটের কৌটো খুলে মেঝেতে থেবড়ে বসে একদম হাভাতে ভঙ্গিতে বিস্কুট খেতে শুরু করলেন। গোটা দশেক খাবার পর—পরদিন নমিতা এল। বাড়ির চাকা ঘুরল।

টিভি মেরামতও হল। টিভির সামনে বসে দেখতে হল—রেললাইনে ছড়ানো যত্নে গড়া রুটি আর দলা পাকানো মাংসপিন্ড। একশো মাইল হাঁটতে হাঁটতে মরে পড়ে গেল বালিকা। মাঝরাস্তায় বাচ্চার জন্ম দিয়ে মা আবার হাঁটতে শুরু করল। আর পারা যায় না । সান্তিয়াগো বুড়ো ভরসা দেয়--আমিও তো চুরাশি দিন কোনো মাছ পাইনি, সেই সময়ে আমার কষ্টের কথা ভাবো একবার ।

ফ্যাক্টরি বন্ধ হলেও এখনো পুরোনো কর্মচারী সবাই যোগাযোগ রাখে । বিহার থেকে সামসুদ, কেরালা থেকে তপন, মহারাষ্ট্র থেকে বিনোদ, গুজরাট থেকে পরেশ,তামিলনাডু থেকে রশিদ--সারাদিন অজস্র কান্নায় মোবাইল ভিজে উঠল রোজ । খাবার নেই,পয়সা নেই,ফেরার পথ নেই । মালিক বলছে -ভাগ যাও,বাড়িয়ালা বলছে -ভাগ যাও,রাস্তায় শুলে পুলিশ বলছে -ভাগ যাও । তাই হাঁটছে ওরা হাঁটছে -- বেকায়দা বুঝে সান্তিয়াগো বুড়োর আর দেখা নেই । নমিতা রান্না করে, মুখে রোচে না । দু'মাস পর সামসুদ, তপন, বিনোদ, পরেশ ঘরে ফিরল কপর্দকশূন্য । যে ঘরে ফিরল সেখানে শুধু একবেলা দু'হাতা ত্রাণের খিচুড়ি । ফিরল না রশিদ, আরো অনেকে।

চাঁদটা ঝুলে আছে নিম গাছের পাতার ফাঁকে। এ বছর বোশেখের গরম তেমন নেই। চাঁদের দিকে মন নেই অণিমার। সস্তার মোবাইল ফোনটা হাতের মুঠোয় চেপে বসে আছে। যদি কোনো ফোন আসে। ঘুমে চোখ লেগে গেলে যদি ফোন ধরা না হয়। যদি ফোনের শব্দে শাশুড়ি জেগে যায়। যদি সে আবার রেগে যায়। যদি শাশুড়ি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সব ভাবনা চুলে জড়িয়ে দাওয়ায় বসে আছে অণিমা। ঢুলুনি আসছে। চাঁদের আলো উঠোনে নিমপাতার ঝালর আঁকছে। দেখার কেউ নেই। এখন দিনেও পথঘাট শুনশান। রাতে কানে তালা লেগে যাওয়া নৈঃশব্দ। সাতদিন আগে শেষ ফোন এসেছিল। অণিমা ফোনটা ঠুকল মাটির দাওয়াতে। যেমন করে সকালে তেলের শিশি থেকে শেষ দুফোঁটা তেল ঠুকে ঠুকে কড়াতে ফেলল --তেমনি ভাবে। যেন পরেশের কথা আটকে আছে যন্তরটার মধ্যে। সুইচ টিপে দাগগুলো দেখল আবার--যে দাগ থাকলে কথা আসে। ব্যাটারি আছে কিনা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভোর রাতে ঘুম এল একটু। দাওয়াতেই আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে চোখে আলো পড়তে ঘুম ভাঙল। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে শাশুড়ি উনুনে আঁচ দিচ্ছে। ওকে ঘুমোতে দেখেও আজ কোনো গালমন্দ করল না শাশুড়ি। রান্নার তাড়াই বা কি । দু 'মুঠো চালও নেই। মেয়েটো তখনো ঘুমিয়ে। পেটে বাড়ছে আর একটা। পরেশ দেড়মাস আগে শেষ টাকা পাঠাতে পেরেছিল ।

মুম্বইতে কাজে যাবার পর মেয়েটার রোজ সকালে দুধ কমপ্ল্যান খেয়ে স্কুলে যাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছিল। এখন এক মুঠো মুড়িও নেই ঘরে । করোনার জন্য হঠাত্ লকডাউন ঘোষণা । পরেশের পরিবারেও চাকা বন্ধ করে দিল । নিজে লঙ্গরখানায় খেয়ে না খেয়ে কাটাল এতদিন । তারপর— রীতাকে এক বিকেলে নমিতা বলল-- এক মহিলা দেখা করতে চায়। উমনো ঝুমনো চুল অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে এক বৃদ্ধা ---মেডামসাব চিনতে পারেন?

কোন এক পুরোনো তারে ঘা লাগল। মেডামসাব এই অদ্ভুত নামে ডাকত কে যেন। মনে পড়ল-কারখানার সেই সবচেয়ে খাটিয়ে লেবার—সুরেশ। সুরেশের বৌয়ের সঙ্গে কখনো হয়তো বিশ্বকর্মা

গল্প ডাঃ শর্মিষ্ঠা দাস

পুজোতে দেখা হয়েছে, মনে নেই । সেই বউ আঁচলের খুটে চোখ মুছে বলল--"ছেলের বউটা পোয়াতি। দশ বছরের নাতনি। ছেলে পরেশ গেছে ভিনদেশে কাজে, কোনো খবর নেই। ঘরে টাকা পয়সাও নেই। কি করি মেডামসাব? সুরেশ মরার আগে বলে গেছে, কোনো বিপদে পড়লে আপনার কাছে আসতে --ভোরে উঠে হেঁটে হেঁটে এলাম"।

আপাতত কিছু টাকা না হয় দেওয়া গেল। তাতে আর কতদিন চলবে। সুরেশের ছেলের খবরই বা কে এনে দেবে। এরপর এল সুজনের বউ ।তারপর বদরুদ্দিনের ছেলের বউ -- তারপর -- তারপর -- আসতেই থাকল কেউ না কেউ। এত সব ছেলে ঘর ছেড়ে দূরে দূরে কাজে যায় কেন -- বেশি টাকার লোভে নাকি এখানে এক আধলা পয়সাও জোটেনা বলে !

এক বিকেলে রকিং চেয়ারে দুলতে দুলতে রীতা ভাবলেন-- মেশিনপত্তর বিক্রি হয়ে গেছে, ফ্যাক্টরির জমিটা তো এখনো আছে,হাত পা গেলেও নিজের মাথাটা আস্ত আছে সেই মার্লিন মাছের মতো --সামসুদ, তপনদের কি একবার ডাকবেন কাল, নতুন করে কিছু শুরু করা যায় কিনা ...।

****

ছবি: সুভম মুখার্জী

নাটক

যদি মানুষ হই…

~ তমোজিৎ রায়

"অদ্ভুত আঁধার এসেছে এ পৃথিবী তে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই – প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাঁদের সুপরামর্শ ছাড়া। যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি, কিম্বা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়"।

-'কানা মাছি ভো ভো যাকে পাবি তাকে ছো'
- না না ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ (সুরে)
- কেন স্যানিটাইসার দিয়েছি, সাবান দিয়ে ধুয়েছি ২০ সেকেন্ড –
-উঁহু এটাই ডেড এন্ড ...আর এগিও না
- না না কাছে এসো না, যাও যাও দূরে থাকো (সুরে)
- দূরত্ব রাখো
- মাপো তিন ফিট মাপো
- খাপে ঢুকে থাকো
- খাপ, খাপে খাপ
- পঞ্চার বাপ
- পঞ্চির ও বাপ
- খুব চাপ
- হোক তবু-
নিজের নিজের খাপ
ঢুকে যাও চুপচাপ, বেরোলেইভরে দেবে লোহার খাঁচায়
একা একাবসে বসে
পোগো দেখো হেসে হেসে
নিজে না বাঁচলে কেউ বাপেরে বাঁচায়?

- মুখ টাও বন্ধ থাক
- ঢাকা থাক মাস্কে
- কি? মুখোশ? কি মুখোশ?
- আছে রঙ্গ বেরঙ্গের বল চাস কে?
- হাসি হাসি
- ভালোবাসি
- দুখী দুখী
- সুখী সুখী
- টু কি !...
- -চক্ষু দুটো দিচ্ছে শুধু উঁকি... টুকি !
- সব কিছুর মুখোশ আছে... কিন্তু রাগের? প্রতিবাদের?
- পোতিবাদ হাঃ হাঃ !
- বাদ
- যদি খুব খুব রাগ হয় ... জিভ শূলোয়
- দাঁত করে কুড় কূড়
- ধুর বলছি না মুখ খোলা বারন
- কারন?
- (গান) কথা বোল না কেউ শব্দ কোরোনা
ভগবান জেগে উঠেছেন
গোল যোগ সহ্য করেন না
- সরাসরি শূলে ।
- উ লে লে
- কান টা ও খুলে ... রেখোনা
- মন্দ কিছু শুনো না
- কিন্তুচোখ? চোখের কথা কিচ্ছু বলে নি তো
- তো?
- দেখছি তো
- কি
- শব...
- কি সব?
- বললাম তো শব ... সারি সারি শব দেখছি শুধু
- ভাইয়ের
- বোনের
- মায়ের, বাপের
- যা রোগ, সব উজার করে
- কোরোনা
- উঁহু মিথ্যে প্রচার কোরোনা
- শুধু কোরনা নয়
-তবে
-একটু সময় হবে?
- একদম
- জামলো মকদম ... শিশু শ্রমিক ছিল
- পায়ে হেঁটে ফিরতে ঘরে, পথেই প্রান দিলো
- কার তাতে কি গেল?
- শুধু ওর মা

নাটক তমোজিৎ রায়

- তাঁর তো ফেসবুক ছিলো না
- আরো কত প্রান চলতে চলতে
সহস্র মাইল চলতে চলতে
বিক্ষত পায়ে চলতে চলতে
পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে
সূর্যের তাপে গলতে গলতে
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটতে ফাটতে
রাষ্ট্রের ঘৃণা মাখতে মাখতে
ঘুমিয়ে পড়ল ... পৌঁছে গেল হারিয়ে যাওয়ার দেশে...
এত বড় দেশে ঘর পেলো না বলে...

- দেশের মাটিতে রক্তের দাগ
- রাষ্ট্রের হাতে রক্তের দাগ
- মানুষের হাতে রক্তের দাগ
- ধুয়ে দেবে কোন ডেটলে
- ডেটল বাজারে নাই
- তাই তাই তাই

কোন ঘরে তে যাই
যেই দুয়ারে যাই
ঝ্যাঁটা র বাড়ি খাই

- কেন ঘরে গেলে ঝ্যাঁটা কেন?
- ইস জানেনা যেন
- যদি তুমি রোগ ছড়াও
- তাই দূরে যাও দূরে চলে যাও
- ডাক্তার ভগবান
- বাঁচান মানুষের জান
- কিন্তু আমার ঘর থেকে যান
- কি তুমি কোরাইন্টাইনে ছিলে? এখানে কেন এলে?
- সুস্থ? তো কি? ইয়ার্কি
- বিদেয় হও
- তুমি নার্স? আশা? জানো না বাংলা ভাষা?
- যাও যাও পালাও
- আমরা মানুষ? ফেসবুকে কাইন্দে ভাসাই? প্রদীপ জ্বালাই থালা বাজাই?
- কিন্তু সময় হলেই ফুস
- মানুষ????
- কিন্তুএখন সময় হোল

মনের আগল খোলো
মেঘ করেছে কালো
মনের আগল খোল
তুমুল ঝড় এলো
মনের আগল খোলো
চাল উড়িয়ে নিলো
মনের আগল খোল
গলা ছেঁড়ে বল
মনের আগল খোল

- মানুষ যদি হই, গলা ছেড়ে কই
- কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে বেঁধে বেঁধে রই
- রাজার দন্ড হাতে নিয়ে যা খুশি তাই কর
- অনেক হোলো খেলা তোমার, এবার গদি ছাড়ো

গান:
অধিকার কে কাকে দেয়?
অধিকার কেড়ে নিতে হয় ।
মুক্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থের অধিকার
স্বপ্নের অধিকার
মানুষের মত করে বাঁচবার অধিকার।।

****

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সাথে

ভ্রমণ কাহিনি

সিকিয়াঝোরায় নৌকা ভ্রমণ : মিহির দে
ঝড় বাদলের যাত্রাপ্রসাদ : দেবপ্রিয়া সরকার
শৈলশহর কালিম্পং : বিনীতা সরকার
নৈঃশব্দের বাতিঘর তুরতুরিখণ্ড এবং পথ, পথিকের জার্নাল : নীলাদ্রি দেব
পাইন ঘেরা লাভা ও লোলেগাঁও এর পথে : হৈমন্তি মজুমদার

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান

জলে জ্বলে স্মৃতি : কূর্মনাড়ী

শ্রাবণ সংখ্যা ১৪২৭

সম্পাদনা: মিহির দে

আনন্দের পরিক্রমা

মিহির দে, সহযোগী সম্পাদক

আনন্দের সন্ধানে মানুষের যাত্রাপথে কখনও কখনও দুঃখ এসে পড়ে কিন্তু তাতে সভ্যতার গতি থামে না - থামে না অন্বেষণের প্রক্রিয়া - থামে না বহির্বিশ্বের প্রতি মানুষের আকুল আকর্ষণ। এই সকল না থামা, চক্রাকার গতি মানুষকে পৌঁছে দেয় আত্মচেতনার অসীম অস্তিত্বে- আত্মমুক্তির পথে। বহুদিন, বহুকাল ধরেই মানবসভ্যতার এই যাত্রা চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যহত থাকবে – সৃষ্টির এমনই গঠনশৈলী। বিবর্তনের ইতিহাসে এককোষী জীব থেকে বহুকোষী উন্নত মস্তিষ্কের মানুষ পর্যন্ত সকলেই নিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে সদা চলমান।

'চরৈবেতি' হিরণ্যগর্ভ পত্রিকার এমনই এক নিয়মিত ও বিশেষ আখ্যান যা মানব সভ্যতার এই বিবিধ গতির এক সম্ভার। এই সম্ভারে যেমন আছে বাংলার অজানা ভ্রমণের কাহিনী তেমনি আছে এদেশের প্রাচীন বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদ – আছে বাংলার প্রাচীন ঔষধি গাছগাছড়ার চর্চার কথা – আছে বাংলার অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাস ও বিবরণ – আছে বাংলার প্রাচীন বাদ্য সঙ্গীত ও শিল্পকলা। ভোজনের অঙ্গে বাঙালীর বিশ্বব্যাপী পরিচয় আছে 'ভোজন রসিক' হিসাবে, তাই 'চরৈবেতি' বাংলার প্রাচীন রন্ধনশিল্পকেও সমান গুরুত্ব দেয়। এই সংখ্যায় সমস্ত কিছুকে মাথায় রেখে কিছু প্রয়াস রইলো। আমাদের আশা 'চরৈবেতি' তার সমগ্র পরিক্রমাতে সন্ধান পাবে সত্যকার আত্মমুক্তির পথ ও আনন্দ।।

ভ্রমণকাহিনি

সিকিয়াঝোরায় নৌকা ভ্রমণ

~ মিহির দে

এই মেঘলা দিনে নিমন্ত্রনের অপেক্ষায় না থেকে পিছুটান হীন বেরিয়ে পড়ি মেঘ পাহাড়ের দেশে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে নেমে যাই চৈতন্য ঝোরায়।গলিপথ থেকে বাতাসের ইশারায় কেঁপে কেঁপে ওঠে অচেনা দুপুর। ভাতখাওয়া আর সন্ধির মধ্যে যে ফাঁক তার ভেতর অনায়াসে ঢুকে পড়ি দুজন যুবক। কোথাও একটা ষড়যন্ত্রের খেলা চলছে। হিসেব মিলছেনা কিছুতেই। হিসেবের গোলোক ধাঁধাঁর থেকে বেরিয়ে এলাম বাঁশের সাঁকোর ওপর। নিচে মায়া জালে ধরা দিচ্ছে গেঁড়ি ও গুগলি।ঘুরপথে কাঠ আসছে মাথায় করে।বানামী বাড়ি গুলি ঠায় দাঁড়িয়ে কয়েক দশক ধরে।ভুল পথে গেলে সবুজ বিকেল হিংস্র হতে পারে অতএব ফিরে আসি জারুল গাছের নিচে। গন্ধ শুনি,দেখি গাছে গাছে প্রজাপতি খেলা। হর্নবিল ডাকে বৈঠকি শেষে পাখিদের ঘরে ফেরা।এখানে মেঘ স্টেশন ছুঁয়ে যায়।বর্ষা এলে যেকোন সময় বৃষ্টিরা ধেয়ে আসে সিগনাল ভেঙে। তখনি জলে ভিজে কাঁপতে থাকে দুটি বন শালিক।

দুপুরের ক্লান্তিকে পিছনে রেখে বাইকের অভিমুখ তখন দমনপুরের দিকে।এক অন্য পথে রোমাঞ্চের হাতছানি।বক্সা–জয়ন্তী রাস্তাকে ছেড়ে বাম দিকে ফ্লাইওভার দিয়ে উঠে গেলেই জাতীয় সড়ক।আমাদের গতিপথ এখন ডানদিকে।রোদেলা ছায়ার ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি কালকূট ব্রিজের উপর। নিচে বোরলি মাছের খেলা।দূর থেকে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার গাছে বসে থাকা ময়ূরের পেখম মেলে থাকা।ওদিকে বাগানের সাইরেন বেজে গেলে ঝুড়ি নিয়ে ফিরে যায় যুবতীর দল।আমরাও এগোতে থাকি সিকিয়াঝোরার দিকে।

ফ্লাইওভার থেকে আসাম রোড ধরে পাঁচ কিলোমিটার এলেই চোখে পড়বে বনদপ্তরের লাগানো দিক নির্দেশ। জাতীয় সড়ক থেকে বাদিকে নেমে যাই উত্তর পানিয়াল গুঁড়ির এক গ্রাম্য পথ ধরে।সামনেই ইটের ভাটা,তাই কিছুটা লাল মাটির পথ। আঁকাবাঁকা পথে কখনও বাঁশের তলায় এসে দাঁড়াই,আবার কখনও পুকুর ধারে। এখানে বাতাস অন্য ভাষায় কথা বলে।এভাবেই মাটির গন্ধে পৌঁছে যাই স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত সিকিয়াঝোরা ইকোস্পটে। ভেতরে প্রবেশ করতে হয় টিকিট কেটে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে শুধুই শূণ্যতা দেখি।

ভ্রমণকাহিনি

মিহির দে

বনভোজনে দূর থেকে ছুটে আসে মানুষেরা।

তবে এখানে ভ্রমণের এক অন্য মাত্রা নিয়ে আসে নৌকা বিহার। নৌকায় কয়েক কিলোমিটার নদী পথ দিয়ে বন জঙ্গলে শিহরণ লাগানো ভ্রমণ অভিজ্ঞতা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। সিকিয়াঝোরা ডুয়ার্সের 'সুন্দরবন' বলা যেতেই পারে। এ পথে রোমাঞ্চকর ঝিঁঝিঁর ডাক।

দেখা যায় হাতির পায়ের ছাপ।নৌকা যত এগিয়ে চলে ততই বাড়তে থাকে অ্যাডভেঞ্চার। কয়েক ঘন্টার ভ্রমণ অনেকটাই তাজা অক্সিজেন ভরে দেবে দেহ যন্ত্রে।

****

কিভাবে যাবেন:
যে কোন ট্রেনে বা বাসে আলিপুরদুয়ার নেমে সেখান থেকে ছোট গাড়ি কিংবা অটো ভাড়া নিয়ে সোজা চলে যেতে পারেন সিকিয়াঝোরা। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় শহরে ফিরেই আসতে পারেন।

কোথায় থাকবেন:
আলিপুরদুয়ার শহরে অনেক কম দামে ভালো মানের হোটেল রয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার পৌরসভানিয়ন্ত্রিত 'অবকাশ' এখানেও বুকিং করে নিতে পারেন।

ভ্রমণকাহিনি

ঝড় বাদলের যাত্রাপ্রসাদ

~ দেবপ্রিয়া সরকার

জন্মসূত্রে শহর জলপাইগুড়ির বাসিন্দা হলেও চাকরির কারণে বছর খানেক থাকতে হয়েছিল ডুয়ার্সের মালবাজার শহরে। পাহাড়ের কোলে চা বাগান ঘেরা উত্তরবাংলার এই জনপদ মন কেড়েনিল অচিরেই। আমি শিক্ষকতা করতাম চালসায়। নিত্য যাতায়াতের পথে ছোট ছোট পাহাড়ি নদী, দূর থেকে চোখে পড়া নীল পাহাড়ের সিল্যুয়েট, বাতাসে ভেসে থাকা চা পাতার গন্ধ তরতাজা করে দিত মনকে। ডুয়ার্সের এই রূপ মাধুরীর টানে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তাম ইতিউতি।

এখানে আসার কয়েকমাস পর অসম থেকে আমার পিসিমণি তার দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মালবাজারে, আমাদের নতুন সংসার দেখতে। ঠিক হল ওদের নিয়ে বের হব ডুয়ার্স ভ্রমণে। যেমন কথা তেমনই কাজ। রোদ ঝলমলে এক চৈত্রের সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ওদলাবাড়ি হয়ে প্রথমে গেলাম গজলডোবা। তিস্তা ব্যারেজ দেখতে। তখনও গজলডোবাকে ঘিরে শুরু হয়নি পর্যটকদের উন্মাদনা। গড়ে ওঠেনি 'ভোরের আলো'। গজায়নি ছোটবড় হোটেল আর ছাউনি দেওয়া চা-চপের দোকান। গজলডোবা তখন ছিল নেহাতই মুখচোরা এক গ্রাম্য কিশোরীর মতো। তার প্রসাধনহীন বুক জুড়ে শুধু বয়ে চলত জল থৈ থৈ তিস্তা। ব্যারেজের কাছে যেতেই সেই মৌন কিশোরী ভেঙে ফেলত তার নীরবতা। খুলে রাখা লকগেট থেকে বেরিয়ে

ভ্রমণকাহিনি

দেবপ্রিয়া সরকার

আসা অবাধ্য ফেনিল জলরাশির উচ্ছলতায় মুখোর হয়ে উঠত সে।

নদীতে ভেসে থাকা জেলে নৌকা আর ভিনদেশী পাখিদের দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকটা সময়। এরপর গাড়ি এগিয়ে চলল কাঠামবাড়ির জঙ্গলে পথ ধরে। শাল, সেগুন, চিকরাশি, ছাতিম এবং আরও অনেক নাম না জানা সারি সারি গাছেদের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে সরু ফিতের মতো রাস্তা। দিনের বেলাতেও গা ছমছমে নির্জনতা চারপাশে। জঙ্গলে ঢোকার মুখে দেখেছিলাম পাথরের ফলকে লেখা, অপালচাঁদ ফরেস্ট। মনে পড়ল দেবেশ রায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'তিস্তাপরের বৃত্তান্ত' তে পড়েছিলাম এই বনের কথা। এখানেই বাঘের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাঘারুর।

ফরেস্ট পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম রাজাডাঙ্গা, ক্রান্তি হয়ে

লাটাগুড়ির পথে। বুক করে রাখাছিল বিকেলের ট্রিপে জঙ্গল সাফারির টিকিট। বুকিং কাউন্টারের সামনেই এক সাজানো গোছানো, ছিমছাম হোটেলে বসে সেরে ফেললাম দুপুরের লাঞ্চ। তারপর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি আর ফটোশুট করতে না করতেই চলে এল জঙ্গল সাফারির সময়। হুড খোলা জিপসিতে উঠে চোখে পড়ল সকালের সেই ঝকঝকে রোদ্দুরটা আর নেই। পশ্চিম কোণ থেকে উড়ে আসছে কুচকুচে কালো মেঘ।

আমরা তখন জঙ্গল ভ্রমণের উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। মেঘের দিকে মন ছিলনা ততটা। মসৃণ পীচের রাস্তা ধরে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে গাড়ি। গন্তব্য গভীর জঙ্গলের ভেতর অপেক্ষমাণ নজর মিনার। নাম, যাত্রাপ্রসাদ।

গাইডের মুখে শুনলাম যাত্রাপ্রসাদ ছিল বন দপ্তরের পোষা হাতি। অনেক বছর কাজ করার পর মারা যায় হাতিটি। তার স্মৃতিতেই জঙ্গলের ভেতর গড়ে ওঠা ওয়াচ-টাওয়ারের নাম দেওয়া হয়েছে যাত্রাপ্রসাদ। জাতীয় সড়ক পেরিয়ে জঙ্গলে প্রবেশের মুখে এন্ট্রি গেটে এসে দাঁড়াল গোটা পাঁচেক জলপাইরঙা জিপসি। ততক্ষণে সারা আকাশ ছেয়ে গিয়েছে মেঘে। আচমকা কোথা থেকে হাজির হল দমকা হাওয়া। পাশেই টিলাবাড়ি চা বাগান। সেখানে চলছিল নতুন প্ল্যান্টেশন। ধূধূ চা বাগান থেকে উড়ে আসছিল রাশি রাশি ধুলো। অন্য উপায় না থাকায় আমরা গিয়ে আশ্রয় নিলাম নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরের ভেতর। বাড়তে থাকল ঝড়। পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও।

নির্জন জঙ্গলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন ঝড়-জলের বিকেল দেখার

একটা আলাদা আনন্দ আছে। কিন্তু সে সময় এত কাছে এসেও জঙ্গল সাফারির রোমাঞ্চ উপভোগ করতে না পারার আশংকার কাছে ফিকে হয়ে যাচ্ছিল সব আনন্দ। প্রায় ঘণ্টা খানেক তাণ্ডব চালিয়ে স্তিমিত হল কালবৈশাখীর দাপট। বৃষ্টি তখনও পড়ছে ভালই। সঙ্গে থাকা গাইডের অভয়বাণী পেয়ে আমরা আবার উঠে বসলাম গাড়িতে। বৃষ্টি ভেজা বনের পথ ধরে এগিয়ে চলল গাড়ি।

দু'এক জায়গায় ভেঙে পড়া গাছ সরিয়ে গাইডরা আমাদের পৌঁছে দিল যাত্রাপ্রসাদে। নিঃঝুম অরণ্য জুড়ে শোনা যাচ্ছে অবিরাম ধারাপাতের শব্দ। কখনও বনময়ূরের কর্কশ স্বর অথবা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। সুদৃশ্য ওয়াচ-টাওয়ারে বসে মুখে টুঁ শব্দটি না করে আমরা অপেক্ষা করছি বন্যপ্রাণী দর্শনের। একটু দূরে নজরে এল একপাল বাইসন। কিন্তু সেই দৃশ্য উপভোগ করতে না করতেই আবার তেড়েফুঁড়ে নামল বৃষ্টি। এবার

ভ্রমণকাহিনি দেবপ্রিয়া সরকার

দোসর মাঝারি আকারের শিল। তীব্র শিলাবৃষ্টির মাঝেই ক্রমশ কমে আসছিল দিনের আলো। আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা ঠিক হবে না ভেবে গাইডরা সিদ্ধান্ত নিল ফেরার রাস্তা ধরার।

আসার পথে রাইনো পয়েন্টে দেখা পেলাম এক পূর্ণ বয়স্ক গণ্ডারের। বৃষ্টি মাথায় রাস্তার পাশে একাকী গজরাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে গিয়েছিল আমাদের গাড়ির কনভয়। ঝড় জল উপেক্ষা করে বেড়াতে আসা ভ্রমণ পিপাসু মানুষগুলোকে দেখে তিনি কী ভাবলেন জানি না। তবে শুঁড় দুলিয়ে একটু পরেই চলে গেলেন অন্য দিকে। যেখানে সেখানে ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছপালা বাঁচিয়ে আমরা অবশেষে বেরিয়ে এলাম জঙ্গল থেকে।

সাফারির জিপসি যেখানে এসে থামল সেই জায়গাটায় তখন জ্বালান হয়েছে আগুন। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে গরম গরম দার্জিলিং টি, স্ন্যাক্স এবং নাচের বেশে একদল আদিবাসী তরুণী। কাকভেজা অবস্থায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করলাম ধামসা-মাদলের তালে তালে আদিবাসী মেয়েদের নাচ।

মাঝ সন্ধে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল রাতের দিকে। ঘড়ির কাটা জানিয়ে দিল আর নয় এবার পালা ঘরে ফেরার।

****

কীভাবে যাবেন: নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন বা বাগডোগরায় নেমে সোজা চলে আসুন লাটাগুড়ি অথবা ধূপঝোরা। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে এসে নামতে পারেন মালবাজারেও। সরকারি-বেসরকারি বাস ছাড়াও পেয়ে যাবেন অজস্র প্রাইভেট গাড়ি। লাটাগুড়ির ন্যাওড়া মোড়ে অবস্থিত বন দপ্তরের অফিস থেকে সরাসরি বুক করা যায় জঙ্গল সাফারির টিকিট।

কোথায় থাকবেন: লাটাগুড়ি, বাতাবাড়ি, চালসা, মালবাজার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অজস্র হোটেল এবং রিসর্ট।

ভ্রমণকাহিনি

শৈলশহর কালিম্পং

~ বিনীতা সরকার

পাহাড় মানে এক গভীর প্রশান্তির স্পর্শ। এক শীতল ভাললাগার স্রোত। ছুঁয়ে যায় মনের খুব গভীরে। মুছে দেয় সব ক্লান্তি, বিষন্নতা ও দুঃখ। মুহূর্তেই আপনাকে করে তোলে সজীব আর প্রাণবন্ত। রোজকার একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে একটু স্বস্তির স্পর্শ পেতে বেড়িয়ে আসতে পারেন শান্ত সবুজ পাহাড়ের কোলে এক অপূর্ব পর্যটন কেন্দ্র কালিম্পং। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে বেশ কিছুদিন আগে ঘুরে এলাম কালিম্পং থেকে আর বুক ভরে নিয়ে এলাম বেঁচে থাকার রসদ। যতবারই যায় ততবারই যেন নতুন লাগে।

শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৬৮ কিলোমিটার দূরে তিস্তা নদীর কোল ঘেঁষে পাহাড়ের বুকে এই শান্ত শহরটি অবস্থিত। এটি ১২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। কালিম্পং এর চমৎকার আবহাওয়া ও এর কাছাকাছি আরো অনেক পর্যটনকেন্দ্র থাকায় ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে কালিম্পং। পথে যেতে যেতে চোখে পড়বে অপরূপ তিস্তার সৌন্দর্য। আপাত সবুজ নীল জলে আপনার মন ভেসে যাবে দূর অজানায়। দূরের ঐ সবুজ পাহাড় হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করবে আপনাকে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ফুটে থাকা নাম না জানা কত শত ফুল শোনাবে তাঁদের মন কেমনের গান। আস্তে আস্তে কুয়াশার ভেলায় চড়ে আপনি পৌঁছে যাবেন এক স্বপ্নালোকে।

কালিম্পং এর ডেলো পাহাড়টি কালিম্পং এর সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট। এখান থেকে কালিম্পং শহরের শোভা সবচেয়ে ভালো দেখা যায়।এর মনোরম পরিবেশ আপনাকে মোহিত করবে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। ডোলো থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব রূপ ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। শুভ্র ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপে মুগ্ধ হয়ে বহু পর্যটক আসেন এখানে আর রাত্রিবাস ও করেন ডেলোতে। ডেলোতে রাত্রি বাসের মজাই আলাদা। রাতের পাহাড়ের সৌন্দর্য অন্যমাত্রা দেয় পুরো কালিম্পং শহরকে। যেন দেখে মনে হয় দূরে পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা। ডেলোতে রাত্রি বাস করার পরে সকালে ঘুম থেকে উঠে অনতিদূরের বিভিন্ন স্পট গুলি দেখে আসতে পারেন। ডেলো থেকে এক কিলোমিটার

ভ্রমণকাহিনি

বিনীতা সরকার

দূরে দেখে আসতে পারেন কালিম্পং সাইন্স সিটি। সাম্প্রতিককালে নির্মিত এই সায়েন্স সিটি বাচ্চাদের অন্যতম পছন্দের জায়গা। পথে যেতে যেতে নজর কাড়বে হনুমানজির বিশাল আকার মূর্তি, বুদ্ধদেবের শান্ত সমাহিত মূর্তি ও বিভিন্ন ফুলের বাগান।

কালিম্পং এ রয়েছে বিখ্যাত তিনটি বৌদ্ধ গুম্ফা। চাইলে সেখান থেকেও ঘুরে আসতে পারেন। মন শান্ত সমাহিত হয়ে যাবে। তবে কালিম্পং এর সবগুলো বৌদ্ধ মনাস্ট্রির মধ্যে জাং ঢোক পালরি ফোডাং সবচেয়ে বিখ্যাত। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই জায়গাগুলি অত্যন্ত পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত। ঘুরে আসতে পারেন মর্গ্যান হাউজ। ব্রিটিশ আমলে তৈরি কালিম্পং এর অন্যতম সবচেয়ে পুরনো বাংলো এটি।

কিছুটা ভৌতিক ব্যাপার এতে জড়িয়ে রয়েছে। দেখে আসতে পারেন ম্যাকফারলেন চার্চ। এটি ১৮৯১ সালে স্কটিশ মিশনারীদের দ্বারা নির্মিত। ঘুরে আসতে পারেন রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে এখানে রোমান ক্যাথলিক চার্চ গড়ে ওঠে।

ঘুরে আসতে পারেন দর্শনীয় স্থান গৌরীপুর হাউজ। শহর থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদচিহ্নকে ধারণ করে আছে বিখ্যাত গৌরীপুর হাউজ। স্থানীয়ভাবে চিত্রভানু নামে পরিচিত। মংপু যাওয়া-আসার পথে রবীন্দ্র ঠাকুর প্রায়ই এখানে অবকাশ যাপন করতেন। পাহাড়ি টিলায় অবস্থিত এই শান্ত নির্জন পরিবেশে এসে আপনার মনে হবে যেন আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন। পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ রিশপ-রিম্বিক। ঘুরে আসতে পারেন কালিম্পং অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র রিশপ রিম্বিক থেকে। এটি লাভা থেকে ১০ কিলোমিটার ও কালিম্পং থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। রিশপে একটা মধ্যযুগীয় অনুভূতির ব্যাপার আছে। কেননা রিশপের রাস্তা অনেকটাই কাঁচা। এখানে এখনো বিদ্যুৎ সেভাবে পৌঁছায়নি। অপার সৌন্দর্যের আধার রিশপ। আর এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যও অপরূপ। নাথুলা পাস, তিন সীমানা, গ্যাংটক, তিব্বতের পাহাড় গুলিসহ এখান থেকে হিমালয়ের অসাধারণ দৃশ্য পর্যটকদের নজর কাড়ে। মন চাইলে ঘুরে আসতে পারেন সবুজ শান্ত ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম লোলেগাঁওতে। কালিম্পং ও লাভা থেকে পাইনের জঙ্গলে ঘেরা আঁকাবাঁকা পথ ধরে লোলেগাঁও যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা। বিস্তৃত ঘন সবুজ অরণ্য ও শান্ত উপত্যকার লোলেগাঁও কে প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে দান করেছে। এখান থেকে ভোরের কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। বন বাংলোর বারান্দায় বসে অদূরে কালিম্পং শহর দেখা যেন এক স্বর্গীয় আনন্দের সমান। আর রাতের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। ভ্রমণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কেনাকাটাও। কালিম্পং এলে অবশ্যই ঘুরে দেখতে পারেন তিস্তা বাজার। কালিম্পং এ ঘুরতে আসা প্রায় সব পর্যটকই এখানে আসেন। সস্তায় অনেক সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। কাঠে খোদাই করা কারুকার্য এই অঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক নৈপুণ্য। কিনে সংগ্রহে রাখতে পারেন তিব্বতি মানুষের হস্তশিল্পের কাজ। এছাড়া সংগ্রহ করতে পারেন তিব্বতি পশমি বস্ত্র, গহনা অলংকার, নুডুলস, স্মারক হিসেবে কিনতে পারেন তাম্রলিপ্ত বস্তু, পার্চমেন্ট, চিত্রাঙ্কন। কেনাকাটার জন্য এগুলো খুবই জনপ্রিয় জিনিস।

কালিম্পং এ কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুল সমৃদ্ধ ফ্লাওয়ার নার্সারি। রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির রংবেরঙের অর্কিড ও নানা পাহাড়ি গাছপালা ও কমলালেবুর গাছের সমাহার। যা দেখে আপনার মন জুড়িয়ে যাবে।

ভ্রমণকাহিনি

বিনীতা সরকার

তার কাছেই রয়েছে নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক আর ডক্টর গ্রাহামস হোম। পাহাড়ি মনোরম আবহাওয়ায় পাহাড়ের পথ ধরে খানিকটা হাঁটলেও মন্দ লাগবে না। পাহাড়ের পথে পথে হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশা গায়ে মেখে হয়তো আপনি ফিরে যাবেন সেই ফেলে আসা অতীতে। এতটাই মায়াবী সেই পথ। ঘুরে আসতে পারেন কালিম্পং আর্টস এন্ড ক্রাফট সেন্টার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে এখানে।

যদি ইতিহাস ভালবাসেন তাহলে ঘুরে আসুন লেপচা মিউজিয়াম থেকে। ইতিহাসের প্রতি ভালবাসা আপনার আরো বেড়ে যাবে। আর আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসেন তাহলে কালিম্পং এর ডেলোতে প্যারাগ্লাইডিং এর ব্যবস্থাও রয়েছে। প্যারাগ্লাইডিং এর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আপনাকে জীবনের সৌন্দর্য আরও একবার উদঘাটন করতে সাহায্য করবে। আপনি মোহিত হয়ে পড়বেন কাঞ্চনজঙ্ঘা আর বাহারি গাছ গাছালির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস এগুলো প্যারাগ্লাইডিং এর সেরা সময়। এসময় আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে। কালিম্পং এ রিভার রাফটিং এর ও সুব্যবস্থা আছে।

সারা বছরই কালিম্পং এর মোটামুটি আরামদায়ক জলবায়ু থাকে। তবে কালিম্পং ভ্রমণ এর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মার্চ থেকে জুন এবং সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। তবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির কারণে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নামে। তবে বর্ষাকালে কালিম্পং পাহাড়ের সৌন্দর্য আরো দ্বিগুন বেড়ে যায়।

****

কিভাবে যাবেন:
কলকাতা থেকে বিমানে পৌঁছে যেতে পারেন বাগডোগরা। সেখান থেকে গাড়িতে চলে আসুন সোজা ডেলোতে। বাগডোগরা থেকে কালিম্পং প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এছাড়া ট্রেনেও আসতে পারেন। কলকাতা থেকে কালিম্পং এর দূরত্ব ৬৪৬ কিলোমিটার।

কলকাতার শিয়ালদা থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় দার্জিলিং মেল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। সময় লাগবে ১২ ঘণ্টা। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বাস, মিনিবাস, বা জিপে করে কালিম্পং-এ পৌঁছতে সময় লাগবে তিন ঘন্টা।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের একাধিক টুরিস্ট লজ রয়েছে এখানে। এছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী বেসরকারি লজেও থাকতে পারেন। এককথায় পাহাড়ের অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করতে কালিম্পং ভ্রমণ একটি আদর্শ পরিকল্পনা।

ভ্রমণকাহিনি

নৈঃশব্দের বাতিঘর তুরতুরিখণ্ড এবং পথ, পথিকের জার্নাল

~ নীলাদ্রি দেব

এখানে একটা পুরো দিন কীভাবে গলে যায় হাতের মুঠো থেকে, বুঝে ওঠা মুশকিল। বুনো পাখিদের ডাক, বাঁশপাতার সরসর শব্দ, শিস দিয়ে এগিয়ে চলা পাহাড়ি ছেলেটির লাঠির মাথায় দুলতে থাকা ছোট ঘন্টা, দূর থেকে ভেসে আসা প্রার্থনা সঙ্গীত, নাগাড়ে ঢং ঢং শব্দ... আদিম এক স্তব্ধতার জন্ম দেয় দেহের আধারে। যা বহন করাই এক ধরণের শিল্প হয়ে ওঠে. আসলে টুরিস্ট আর ট্রাভেলরের মধ্যে যতটা পার্থক্য, ততটাই বাঁচা আর হৈহৈ বেঁচে থাকার মধ্যে। হৈহৈ কোনো অর্থেই হৈচৈ নয়। আসলে এখানে কোনো স্পট নেই সে অর্থে। তাই পুরোটাই কখন যে আস্ত আনন্দউৎস হয়ে উঠেছে, কেউ আলাদা করে বলতে পারবে না। যেদিকেই তাকাই, হঠাৎ নতুন কিছু খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনা জাপ্টে ধরছে। বাতাসে বইছে গানের অনন্ত সুর। যা শুধু স্পর্শ চায়. বর্ষা বলে নয়, সব ঋতুই নতুন নতুন ভাবে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত. অতিথি আপ্যায়নে এ এলাকার মানুষও সিদ্ধহস্ত। বেশ কিছু হোমস্টে নজরে এসেছে।

সবুজের পাশে বর্ষা অনেকটা সত্যি হয়ে ওঠা স্বপ্নের মতো। আমরা এমন এক সময়ে গিয়েছিলাম, সারাটা দুপুর, বিকেল বৃষ্টি আসছে, যাচ্ছে। আমরা গান কবিতা আড্ডা খুনসুটি গ্রামীণহাট লোকগল্প ইতিহাসের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছিলাম। এখানের হাট আলাদা ভাবে নজর কাড়ে. শুধু এখানের নয়। সমস্ত ডুয়ার্সেরই। যদিও ডিজিটালাইজড হতে হতে গত দশকের মূল এককগুলোকেও আদিম মনে হয় আজকাল। তবু গত দশকের কিছু টুকরো ছবি এখানে ধরা আছে সেপিয়া ছবির মতো। শেষ দুপুরের পর জমে ওঠা হাটের সরব ছন্দ। হাঁক। ও মাঝে মাঝে মোরগের দরাদরি।

ভ্রমণকাহিনি

নীলাদ্রি দেব

দুলে ওঠা পায়ে, আচ্ছন্ন চোখে গান গেয়ে হেঁটে চলা বৃদ্ধ চা শ্রমিক। এসব মিথ হলেও মিথ্যে নয়। হাটঘুরুয়া মানুষদের প্রতিটি মুহূর্তই তো জীবনকে বয়ে চলা বর্ণপরিচয়। ওঁরা একটানে খুলে দেয় পোশাকি মুখোশ। তাই জীবনের মুখোমুখি হতে এতটা সাহসের দরকার। বিশ্বাস করুন, এখানে এখনও কোনো ফ্লাড লাইট নেই। ফ্ল্যাশবাল্ব। হাইমাস্ট বাতি। কুপি জ্বলে ভেঙে যাওয়া হাটের মাঠে। কুপি থেকে তেল গড়িয়ে যায়। আলোপোকা লেগে থাকে। দূরে জোনাকির আলো তীব্র হয়ে ওঠে। বন ও বন্যপ্রাণীর মাঝে মানুষ সাড়া দিয়ে ওঠে! শ্বাস কমে আসলেও শ্বাসই তো বাঁচিয়ে রাখে। ভূগোলের এটাই নিয়ম। সবটাই পারস্পরিক শ্রদ্ধায় এগিয়ে চলে। আজও। এখানে এলে প্রত্যেকের প্রথমেই জেনে নেওয়া উচিত, এটা কোনো চিড়িয়াখানা নয়। তাই খোঁজ। খোঁজ। খুঁজে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। যে খোঁজ জীবনের। সে খোঁজই সবুজ থেকে উঠে আসা প্রাণের স্পন্দনের। এসব জেনে কিংবা বুঝে ওঠার পরও মিহি উলেন সুতোয় কেউ বুনতে থাকেন অন্ধকারের আলো, রহস্যের সরাইখানা।

প্রত্যক্ষ করছি... এমন সময় হল্লা পার্টির আওয়াজে খানিকটা নড়ে বসতেই বুঝলাম, পনেরো/ কুড়ি ফুট দূরত্বের মধ্যে চলে এসেছে একোয়া কিশোর হাতি। উত্তেজনা কতক্ষণ ছিল জানি না। উন্মাদনা ছিল, যা বহন করছি আজও, চোখের পলকে নিজের রাস্তা বদলে অন্ধকারে মিশে গেল হাতিটি। শুধু দুএকটা গাছ ভেঙে যাবার প্রবল শব্দ হল।

এসব পেরিয়ে বৃষ্টিবন্ধ পথ, শ্যাওলা মাখা পুরোনো কাঠের বাংলো, বনমোরগের ডাক, জলজমা উঠোন, সুপুরিবাগান, শশাগাছ সমেত ভাঙা দেওয়াল আর ছেত্রী পরিবারকে এক মায়াময় জীবনের কাছে রেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল চেনা ঠিকানায়। কিন্তু এই জার্নি জীবন দেখিয়েছিল। স্পর্শ দিয়েছিল মনের আরামের।

ভূগোলের গায়ে এই কাটাকুটি খেলাকে বারবার মনে হয়েছে শুধুই পথ ও পথিকের জার্নাল... ।।

****

পথনির্দেশ:

আলিপুরদুয়ার- শামুকতলা- হাতিপোতা- তুরতুরিখণ্ড ।

ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি যাতায়াত করে। আলিপুরদুয়ার থেকে খুব বেশি হলে সোয়াঘন্টা রিসর্ট/ হোমস্টে আছে।

*কোনভাবেই পিকনিক স্পট ভেবে গুলিয়ে ফেলবেন না *

ভ্রমণকাহিনি

পাইন ঘেরা লাভা ও লোলেগাঁও এর পথে

~ হৈমন্তি মজুমদার

উত্তরবঙ্গের এক জনপ্রিয় পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চল লাভা ও লোলেগাঁও। অনেক দিনের পরিকল্পনার পর চার বন্ধু মিলে যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কেটে নিলাম। শিয়ালদাহ স্টেশন থেকে দুপুর ১:৩০ মিনিটে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে রওনা দিলাম নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে। উত্তর বঙ্গে ট্রেন ঢোকা মাত্রই মন আনন্দে ভরে উঠল। ভোর হতে হতেই পৌছে গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। আগে থেকেই গাড়ি বুক করে রাখা ছিল লাভার উদ্দেশ্যে তাই কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

এবার গাড়ি চলছে লাভার উদ্দেশ্যে। পাহাড় সবসময়ই সুন্দর। ঘন নীল

পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা পাইন ফারের স্বপ্নসবুজ অরণ্যেড়র অভ্যলন্তরে। গাছগুলো দেখে মন হয় যেন আকাশ ছুঁতে চায়। মন ভরে যায় মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায়। এভাবেই পৌঁছে গেলাম ডামডিম সামনে পরবে গরুবাথান। খুব সুন্দর জায়গা একটু বিশ্রাম নিয়ে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম লাভার উদ্দেশ্য। ডামডিম থেকে লাভা প্রায় ৫৬ কিমি। সামনে পড়ল গরুবাথান। গাঢ় নীল আকাশের নীচে শুধুই পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো বনবাংলো। বাংলোর নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। আমি ও বিভাস দুজনে মিলে নদীর পাশে একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসলাম। প্রকৃতির সৌন্দর্য যা এখানে না আসলে হয়তো কোনো দিন জানতাম না। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে বয়ে যাওয়া জলের রুমঝুম শব্দ শুনতে শুনতে দিনের শেষে চলে যাওয়া লাভার দেশে।মন যেতে চায় না তবুও রওনা দিলাম লাভার পথে। সন্ধ্যা হতে হতেই পৌঁছে গেলাম লাভা। আগে থেকেই রির্সর্ট বুক করা ছিল, তাই কোনো অসুবিধা হয়নি।অতএব এবার রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, সেই সময় মেঘ যেন ফিরে এসে স্বপ্ন হয়ে মিশে যায় সত্যিকারের স্বপ্নের মতো। ভোরের প্রথম আলো যখন কাচের জানালা দিয়ে কটেজে ঢুকে পড়ল তখন ঘুম প্রায় ভেঙ্গে গেছে। বুঝতে পারিনি কোন দৃশ্য বেশি সুন্দর বাইরের না ভিতরের --এই সময় মনে হয় স্বপ্নের রাত, না বাস্তবের সকাল। রির্সর্টের ম্যা নেজার বলল টিফিনদাড়া থেকে দেখা যায় সূর্যাদয়ের দৃশ্য।

সূর্যাদয়ের দৃশ্য দেখার পর রওনা দিলাম মনাস্ট্রির প্রাঙ্গনে। সেখান থেকে দেখা যায়, প্রায় ৭২০০ ফুট উঁচু লাভার জীবন যাত্রার সচল ছবি। প্রায় সারা বছরই দেখা যায় রমণীয় দৃশ্য। এই স্থান, এই পথ যেন পর্যটকদের জন্য উৎসর্গীকৃত। বড়ো বড়ো ধুপি গাছের বনবাংলার পরিবেশ এক কথায় মর্মছোঁয়া।

মনাস্টির প্রাঙ্গণ থেকে সোজা চলে গেলাম ঝান্ডিদাড়া সান রাইজ পয়েন্ট। সেখানে থেকে 'ক্যা নোপি ওয়াক'।

ক্যা নোপি ওয়াক' থেকে পাওয়া জীবনের অন্যনরকম এক অনুভূতি যা ভোলার নয়। লাভা থেকে লোলেগাঁও প্রায় ২৪ কিমি। কিন্তু সেই রাত আমাদের থাকতে হলো বন দপ্তরের নেচার এডুকেশন অ্যা ন্ড ওয়াইল্ডারনেস রির্সর্টের কটেজে। রাত জাগা পাখির মতো চার বন্ধু মিলে

ভ্রমণকাহিনি

হৈমন্তি মজুমদার

কটেজের কাচের জানালা দিয়ে লাভার দৃশ্য দেখলাম। জোনাকির মতো মিটমিট করছে ঘরের বাতি, চারদিক নিস্তব্ধ।

পরদিন সকালে রওনা দিলাম লোলেগাঁও এর পথে। যেতে যেতে দেখেছি মেঘে ঢাকা পাহাড়ের নতুন রূপ। মনে হয় মাঝে মাঝে পাহাড়ের পেছন থেকে উঁকি মারছে মেঘ। ধুপি গাছ ও নানা প্রজাতির গাছ দ্বারা শোভিত লাভা থেকে লোলেগাঁও যাবার পাহাড়ি পথ। সে এক লাবণ্য আপন করে কাছে টেনে নেয় ভ্রমণপিপাসু মানুষদের। তেমনি আমাদেরও কাছে টেনে
নিয়েছিল প্রকৃতি। এই ভাবেই দুদিন কেটে গেল, এখন তো বিদায় বেলা। মন যে চাইছে না যেতে প্রকৃতির সৌন্দর্য ছেড়ে। কিন্তু যেতে তো হবেই, তাই বাড়ির উদ্দেশ্যে পাহাড়ের বুক বেয়ে ছুটল গাড়ি। নিস্তব্ধ সবুজের মাঝে চলেছে গাড়ি। যেতে যেতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললাম,

ও পাহাড়.....ও পাহাড়....
দেখা হবে কবে আবার...
ও পাহাড় তোমার সাথে,
জীবনের অন্য বেশে।

****

কিভাবে যাবেন: শিয়ালদাহ স্টেশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পযর্ন্ত ট্রেনে। তারপর ভাড়াগাড়িতে লাভা ও লোলেগাঁও।

কোথায় থাকবেন: পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়নের অতিথি নিবাস, এছাড়া অনেক কটেজ রয়েছে।
বুকিং এর ঠিকানা: শিলিগুড়ি--পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং। দূরভাষ: (০৩৫৩) ২৫১৬৩০৬। আলিপুরদুয়ার -- আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল ম্যা নেজার, বক্সা লগিং ডিভিশন, ডাক: আলিপুরদুয়ার। দূরভাষ: (০৩৫৬৪) ২৫৫০০৪।

অনলাইন বুকিং: www.wbfdc.com

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান

জলে জ্বলে স্মৃতি

~ কূর্মনাড়ী

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের ভূখণ্ডের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য এবং সমন্বয়পূর্ণ অস্তিত্ব হিসাবে উঠে আসে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাবলী যা ধর্মগ্রন্থাবলী হিসাবে অধিক পরিচিত, অস্তিত্বের সাথে জড় ও সজীব উভয় প্রকৃতিকেই সশ্রদ্ধভাবে সম্পর্কযুক্ত করে। প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে প্রকৃতির উদ্ভিদ ও জীবকুল উভয়কেই সুস্থ বাস্তর টেকসই সত্ত্বা হিসাবে ভাবা হয়। এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে জল ও অরণ্যের সংরক্ষণের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সূত্রগ্রন্থে প্রায়শই সমন্বয়পূর্ণ মানবজীবন ও প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ছে।

"আমাকে শক্তিমান করো! সমগ্র সৃষ্টি আমাকে বন্ধুর মতো বিবেচনা করুক, আমিও সমগ্র সৃষ্টিকে বন্ধুর মতো বিবেচনা করি। বন্ধুর চোখে আমরা একে অপরকে পরিচিত করি" (যজুর্বেদ, ৩৬.১৮)। পুরাতন ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সজ্ঞাত বোঝাপড়ার উপর জোর দেয়। হয়তো অনেকটাই দার্শনিক মতাদর্শ যার সঠিক অনুধাবন দক্ষতা ও চেষ্টার মাধ্যমে করা যায়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণসমূহ, মহাকাব্য এবং পান্ডিত্যপূর্ণ লেখাগুলি যেমন 'ময়ূরচিত্রকা', 'বৃহৎ সংহিতা' বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃতিক জ্ঞানের আকর। ত্রুটিপূর্ণ আচরণ মা পৃথিবী ও পিতা বায়ুমণ্ডলকে দুষ্ট করে, রুষ্ঠ করে, আবার দায়িত্বপূর্ণ আচরণ যেমন আমাদের সুসন্তানে পরিণত করে তেমনি মাতাপিতার পূর্ণ আশীর্বাদ থেকে আমরা কখনো বঞ্চিত হই না – এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় ধারনা।

প্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যেকটির সাথেই এক একজন আরাধ্য দেবতার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে নানাবিধ কারণে। হয়তো আজকালকার দিনে বেশিরভাগটা নেহাতই নিছক সংস্কার। কিন্তু ভিতরের বৈজ্ঞানিক কারণগুলো এইসব পৌরাণিক চরিত্রদের আজও হঠাৎ সজীব করে তোলে। ইন্দ্র, বরুণ জলের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমনই সব নাম। ঋগ্বেদের সুক্তে 'পৃথিবীর গয়না' হিসাবে জলকে তুলে ধরা হয়েছে বা বলা হয়েছে পৃথিবী 'জলের প্রাচুর্যে আশীর্বাদপুষ্ট'। যেমন বহির্জগতে তেমনি শরীরের গঠনকাঠামোতে জলের গুরুত্ব ও পরিমাণ জলকে এক স্বতন্ত্র জায়গা দিয়েছে। মানবশরীরের প্রায় বাহাত্তর শতাংশ জল দিয়ে গঠিত আর গোটা পৃথিবীর তিনভাগই জল। তাই তো জল জীবন।

জীবনের দার্শনিক অংশে জল:

বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে জল ও জলতত্ত্ব অনেকভাবে জায়গা পেয়েছে। পঞ্চমহাতত্ত্বের সব থেকে মহান ও বৃহত্তম উপাদান জল। জীবনদায়ী গুণাবলীর জন্য চার বেদেই জলকে পুজোর যোগ্য দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে। আত্মসচেতনতার মূর্ত প্রতীক জল'এর স্তুতিতে বহু শ্লোক পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। জলের প্রাচীন ডাকনামগুলি শুনলে মন ভালো হয়ে যায়, যেমন, 'জীবনের উৎস', 'পৃথিবীর রক্ষাকর্তা', 'পরিবেশপালক', 'অমৃত', 'মধু', 'সমৃদ্ধিউৎপাদক', 'শুদ্ধিকারক', 'পাপহরক', ইত্যাদি। জল হল পঞ্চমহাতত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব যা থেকে পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন এসেছে। তাই তো জল জীবন এবং জীবিত সকল অস্তিত্বের একমাত্র আশ্রয় ও প্রয়োজন।

'দিব্যজল' এমন এক প্রতীকী জল যার মধ্যে 'শীতম' (স্পর্শে শীতল), 'শুচিহি' (পরিশুদ্ধ), 'শিবম্'(প্রয়োজনীয় খনিজ ও উপাদানে পরিপূর্ণ), 'ইষ্টম্' (স্বচ্ছ) এবং 'বিমলম্ লহু সদ্গুনম' (অম্ল-ক্ষার সামঞ্জস্যপূর্ণ) - এই পাঁচটি বৈশিষ্ঠ্য আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের পূত পানীয় হিসাবে জলের খ্যাতি দেবতামহলেও (ঋগ্বেদ, ৭.৪৭.১)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ অনুযায়ী, 'মহাজাগতিক সত্ত্বা থেকে স্থানের উৎপত্তি, স্থান থেকে বায়ুর, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে গাছগাছড়া, গাছগাছড়া থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্য থেকে ব্যাক্তির সৃষ্টি'। 'জল থেকে পৃথিবী' – এটাই পরিষ্কার করে যে জল থেকে ব্রহ্মাণ্ডের আদিম দশার উৎপত্তি। মোটের উপর দার্শনিক যুক্তিতে জল সমস্ত কিছুতে ব্যপ্ত এবং ব্যপ্ত সমস্তকিছুই আসলে জল (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭.১০.১)।

জল – অনুপ্রেরক ও আনন্দের উৎস:

জল হল আনন্দের উৎস ও শক্তি যার একপ্রকার দ্যুতি আছে (অথর্ব বেদ সংহিতা iii-১৩-১৪)। জল হল মায়ের মতো মমতাশীল যে তার সন্তানদের ভালোবাসে। "যেহেতু জল আনন্দের উৎস, আমাদের এর প্রাচুর্য্য উপভোগ করতে দেওয়া হোক" (ঋগ্বেদ, ১০.৯.১)। জল যেন সাক্ষাত সমৃদ্ধির প্রতিমূর্তি। জলই ঈশ্বর অবধি পৌঁছানোর পথ প্রশস্থ করে, জল নিজেই সেই দিব্য অস্তিত্ব যা প্রাণ এর মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়।

"সূর্যের আলোতে জল বাষ্পায়িত হয়, ইন্দ্র তাঁর ঐশ্বর্য্যের দ্বার খুলে দেন এবং আমাদের আশীর্বাদ পুষ্ট করেন" (ঋগ্বেদ, ৭.৪৭.৩-৪)। 'এই পৃথিবী যার উপর সমুদ্র, নদী ও বিভিন্ন জলাশয়রা বয়ে চলে- যা খাদ্য প্রস্তুত করে- যার উপর ভিত্তি করে সকল প্রাণ শ্বাসক্রিয়া চালায়, সেই পৃথিবী আমাদের এই সবকিছুর বাগদত্তা করুক' (অথর্ববেদ-ভূমিসুক্ত)। এই সমস্ততে বৃষ্টির একটি বৃহৎ ভূমিকা আছে এবং তা এতোটাই প্রকট যে বৃষ্টি ছাড়া সমুদ্রের অসীম ঐশ্বর্য্যও কমে আসে। তাই তো জল জীবন।

বিশোধক হিসাবে জলের ভূমিকা তাকে জীবনদায়ী এবং জীবনধারক পদার্থে পরিণত করেছে অনেকটাই। যজুর্বেদের ধারণা অনুযায়ী, বৃষ্টির জলের মধ্যে গোটা পৃথিবীর দূষণ আসলে শোধিত হয়, প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা জলের কাছে শোধনের জন্য প্রার্থনা জানাতেন। অথর্ববেদেও এর ব্যতিক্রম হয় না। মোটের উপর জল সৃষ্টির জনক (ঋগ্বেদ, ৬.৫০.১)। জলের ঔষধসম্বন্ধীয় গুণাবলীও যথেষ্ট। বেদে জলের ঔষধি গুণ ও শুশ্রূষা করার ক্ষমতার উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির উপর বেদে বারবারই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলকে সমস্ত আরোগ্যক্ষম ঔষধির আধার বলা হয়ে থাকে। 'হে জল! যা আমরা পান করি আমাদের শরীরকে তেজ দেয়। হে দিব্য অমর জল, তুমি আমাদের রোগজ্বালা দূর করে মধুরতা বজায় রাখো' (ঋগ্বেদ, ৬৩)। অথর্ববেদের বিভিন্ন স্তবেও রোগ দূরীকরণে জলের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

এখন মুস্কিলটা হচ্ছে যে, জলের প্রতি এই সমস্ত আবেদন ও প্রার্থনা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত নাকি আমাদের মনের ভয় ও জমা অন্ধকার আমরা অদৃষ্টের প্রতি সমর্পনের প্রবণতা দেখিয়েছি মাত্র? ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে জলের এই রাজকীয়তা, সিংহাসন এবং শাসন কি সত্যিই জলকে একবারের জন্য সচেতন করে কার্যে প্রবৃত্ত করে? এইসকল প্রশ্নের অন্বেষণেই এই নিবন্ধ।

এবার একটু বুঝে নেওয়া যাক, এই জল যা কিনা সৃষ্টির আধার, আনন্দের উৎস, প্রেরণাদায়ক এবং মহান ঔষধি তাকে পরিশুদ্ধ করবার প্রাচীন কি ধরণের পদ্ধতি আছে আর তার সাথে বুঝে নেওয়া যাক এই দিব্য তরলকে কেন্দ্র করে আমাদের বিভিন্ন রাজ্যে কতধরনের অনুষ্ঠান ও লোকসমাবেশ উঠে এসেছে।

জল পরিশোধনের চর্চা:

বেদ ও আয়ুর্বেদের বিভিন্ন লেখনীতে জলের গুনগত মান বজায় রাখার জন্য নানান পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে কিছু প্রাচীন ও কার্যকরী পদ্ধতি বুঝে নেওয়া যেতে পারে। বরাহমিহির লিখিত ও প্রণীত 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে কলুষিত উৎস থেকে জলকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য উদ্ভিদ, ধাতু ও তাপযোগে বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের শোধনের কথাও সেখানে আলাদা করে বলা হয়েছে।

কূপের জল পরিশোধনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় 'অঞ্জন', 'ভদ্রমুষ্ঠা', 'ভেটিভার ঘাস', 'আমলা' ও 'ভুঁই আমলা'র চূর্ণ ব্যবহার করা যায়। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক শুশ্রুত বিস্তারিতভাবে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে জল শোধনের ব্যাখ্যা রেখেছেন। পঙ্কিল জলে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহারে পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে – 'ভুঁই আমলা'র বীজ, পদ্মের বীজ, শেওলার রাইজোম এবং তিনধরনের রত্ন, 'গোমেদ', 'মুক্তো', 'কোয়ার্টজ' এর যৌথ ব্যবহার উল্লেখ্য। শুশ্রুতের মতে কলুষিত জলকে সূর্যের আলোতে রেখে দিলে বা তপ্ত লোহার দণ্ডের স্পর্শে বা গরম বালিতে রেখে দিলে সেই জল শোধিত হয়। এগুলি ছাড়াও কিছু প্রাচীন পদ্ধতি আজও বহুল প্রচলিত, যেমন, ফটকিরির ব্যবহার জলের আবিলতা ও অবাঞ্ছিত রঙ দূর করতে কার্যকারী, শুধুমাত্র তুলসি পাতাও অনেকাংশে লাভপ্রদ। কূপ বা জলাশয়ে জ্যান্ত কচ্ছপ রেখে দিলে জল পরিশোধিত হয় কেননা কচ্ছপ মানুষের জন্য ক্ষতিকর বহু সূক্ষ্ম জীবকে খেয়ে ফেলে। কলুষিত জলকে পরিশুদ্ধ করতে সজিনা বীজের গুঁড়ো ব্যবহার করা যায় যা শরীরের অন্য অনেক কাজেও দেয়। এছাড়াও সজিনা বীজের গুঁড়ো, মোটা বালি, কাঠকয়লা ও নুড়ির ব্যবহার করা হয় যা কলুষিত জলের 'বায়ুজীবি মেসোফিলিক ব্যাকটিরিয়া' (ই-কোলাই, কলিফর্ম, সিউডোমোনাস, ইস্ট, ইত্যাদি) বিনষ্ট করে – "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার" গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডে এইভাবে পরিশুদ্ধ জলের মান্যতা আছে।

পিতলের পাত্রে জল সংরক্ষণ বা মজুত করা স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত। অণুজীববিজ্ঞানীদের মতে প্লাস্টিকের থেকে পিতলের (তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি এক সংকর ধাতু) পাত্রে জল রাখলে তা বহু জলবাহিত রোগের থেকে সুরক্ষা দেয়। পিতল ও কাঁসার পাত্রে খাবার খাওয়া ভারতবর্ষের এক প্রাচীন রীতি যা একান্তই বিজ্ঞানসম্মত ও সুলভ। কাঁসা (তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি একপ্রকার সংকর ধাতু) হল এমনই এক যাদুকরী ধাতু যা জলে অতিক্ষুদ্র কণার সঞ্চারনের মাধ্যমে মানবশরীরের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া বিনষ্টে সক্ষম।

সামাজিক ও ধার্মিক ঐতিহ্যরূপে জল:

এদেশের সামাজিক ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে জলকে এক উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে- খুবই স্বতন্ত্র্য এই স্থান। এই বিশেষ স্থান লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা পালনে এবং উৎসবের আয়োজনের পদ্ধতিতে। জল হল সেই অপরিহার্য্য তরল যা বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে ও সামাজিক প্রথাতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে ধাতু বা মাটির কলসীকে নদীরূপে কল্পনা করে তাতে জল রেখে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন আজও উজ্জ্বল। জল ও অগ্নিকে মানুষের সমস্ত কৃতকর্মের 'দিব্যসাক্ষী' হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কেননা এটা মনে করা হয় যে জল এই সমস্ত কিছু মনে রাখবে এবং উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

জলকে কেন্দ্র করে এদেশে নানান ধরণের উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রচলন বহু যুগ ধরেই। ভারতবর্ষের মহান নদীগুলিতে লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে 'পুণ্যস্নান' নতুন কিছু নয়। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়াও ইদানীং ছোটখাটো শহরে ও গ্রামেগঞ্জে এই সকল অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র সংস্করণ

পৌঁছে গেছে সাদরে।

এইসব অনুষ্ঠানে মহাদেবের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়, শস্যশ্যামলা পৃথিবীর কামনায় নদীর জলে বিভিন্ন পুজোর প্রচলন আছে। 'পুষ্করম' উৎসব ভারতের উল্লেখযোগ্য বারোটি নদীর (গঙ্গা, নর্মদা, সরস্বতী, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, ভীমা, ব্রহ্মপুত্র, তুঙ্গভদ্রা, ইন্দাস ও প্রাণহিতা) যে কোনো একটিকে কেন্দ্র করে বছরের কোনো এক সময়ে রাশি বৃহস্পতির ভিত্তিতে উৎযাপিত হয়। আদিপুষ্করম-অন্তপুষ্করম মোট চব্বিশ দিনের এই উৎসব আর এর সাথে যুক্ত শক্তিমান পুষ্করের কাহিনী তো আমরা অনেকেই জানি। বিভিন্ন রাজ্যের হিসাবে দেখে নেওয়া যাক জলকে কেন্দ্র করে পালিত উৎসবগুলির কয়েকটি।

সর্বপ্রথম যে নামটি মনে আসে তা হল 'কুম্ভমেলা'। জলের প্রতীকীবাদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনসমাবেশ এই মেলা। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ সমবেত হয় এই মেলাতে। প্রতি বারো বছর, বারো বছরের অর্ধেক ও বারো বছরের বর্গের হিসাবে 'অর্ধকুম্ভ', 'পূর্ণকুম্ভ' ও 'মহাকুম্ভ' অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড ও মধ্যপ্রদেশ এর নির্দিষ্ট কিছু স্থানে প্রতিষ্ঠা হয় "কুম্ভ" (সৃষ্টির সমস্ত শক্তি যে কলসীতে রাখা হয়)। এছাড়াও প্রতিবৎসর 'মাঘমেলা'কে কুম্ভমেলার বাৎসরিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। 'গঙ্গা দশারা সাগর' হল আর একটি বৃহৎ আনুষ্ঠান যার সাথে সাগররাজার ৬০,০০০ সন্তানের হাড় ভাসানোর কাহিনী যুক্ত। মূলত গঙ্গাকে কেন্দ্র করে এই মেলা ও অনুষ্ঠান।

'মকর সংক্রান্তি' যা একমাত্র অধুনা পশ্চিমবঙ্গে পালিত হয় সেই স্থানে যেখানে গঙ্গা সাগরে মিলিত হয়। সূর্য যখন ধনু থেকে মকর রাশিতে সঞ্চার করে সেই লগ্নে গঙ্গার মোহনাতে বহু মানুষ ডুব দিয়ে 'পুণ্যস্নান' করে থাকেন। মহর্ষি কপিলের আশ্রম এর সাথে যুক্ত এক বিশেষ তীর্থক্ষেত্র। এইভাবে জলকে কেন্দ্র করে কেরলে 'নৌকা উৎসব', তামিলনাড়ুর 'আড়িপেরুক্কু', কর্ণাটকের 'তুলাসক্রমনা', হিমাচলের 'মিনসার', ওড়িশার 'কার্ত্তিক পূর্ণিমার মেলা', মধ্যপ্রদেশের 'গঙ্গাদশমী', হরিয়ানার 'তিজউৎসব' ও 'চেতার চৌদাস মেলা' উল্লেখ্য। বিহারের 'ছট্' বা 'সূর্যপুজা' জলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এছাড়াও মনিপুরের 'ইয়াওসাং', উত্তরপ্রদেশের 'গঙ্গা মহোৎসব' এবং গুজরাটের 'ঋষিপঞ্চমী' অনন্য নজীর রাখে।

জলের জ্বলন্ত স্মৃতিশক্তি:

জলের এহেন গুরুত্বের মুখ্য কারণ হল জলের আছে এক অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। এটা আজকাল বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত যে জল সবকিছু মনে রাখে। জলের সংস্পর্শে আসা যে কোনো ঘটনাই জলের আণবিক স্তরে বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটায় এবং এই পরিবর্তন জলকে এক জীবিত 'তথ্যের আড়ৎ' এ পরিবর্তন করে। প্রফেসর মোনতাগনি'র (যিনি ২০০৮ সালে নোবেল প্রাইজ পান) মতে যে কোনো পদার্থের 'ডি এন এ' একধরনের হালকা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বের করে যা জলের আণবিক গঠনকাঠামোর আমূল পরিবর্তন করতে পারে এবং এই পরিবর্তন বহুদিন বা বহুযুগ স্থায়ী হতে পারে। তাই জলের উদ্দেশ্যে করা সকল প্রার্থনাই জল মনে রাখে এবং সেই অনুযায়ী নিজের গুণাবলীর প্রয়োজনীয় পূনর্বিন্যাস করতে পারে। শুধু তাই নয়, জল তার প্রতি করা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খারাপ মনোভাবও মনে রাখে। যদিও জল এতোটাই নমনীয় যে আমাদের মধুর স্পর্শে সে আবার নিজেকে পালটে ফেলতে পারে ঐ একই আণবিক পুণর্গঠনের প্রণালীর মাধ্যমে আর এতে জলের রাসায়নিক গঠনের কোনো হেরফের হয় না, মানে বাইরের থেকে দেখতে একই থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের বহুতলগুলিতে যে পাম্পিং পদ্ধতিতে জল আসে তা যদি সরাসরি কল খুলে পান করা হয় তা বিষপানের সমতুল্য। কেননা যে পদ্ধতিতে বহুতলে চাপের সাথে পাইপের একাধিক বাঁক পেরিয়ে জলকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় তা জলের স্মৃতিতে খুব একটা ভালো অনুভূতি রাখে না – জল তার প্রতি হওয়া এই নির্যাতন ও দূর্ব্যবহার মনে রাখে। প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুযায়ী পানীয় জলকে প্রফুল্ল মনে কোনো তামা, কাঁসা বা মাটির পাত্রে অনেকক্ষণ রাখার পর দুহাতে নিয়ে পান করা শ্রেয়।

জলের প্রতি এই আচরণ জলকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে আণবিক পূণর্গঠনে সহায়তা করে এবং ফলস্বরূপ জলের স্বাদ ও কার্যকারিতা আমাদের প্রতি সুস্থ হয়। তাই জল নামক জীবনের সাথে যদি সুব্যবহার করা যায় অন্ততঃ পক্ষে আমাদের বাহাত্তর শতাংশ সুন্দর ও সুবিন্যস্ত হওয়া সম্ভব – জল আমাদের এই আশীর্বাদ করুক।

'ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয় আপোভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ' (হে জল যে পবিত্র দিব্যতার আশা করা হয় তা যেন তোমায় পান করবার সময় উপস্থিত থাকে। এই পবিত্রতা যেন আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়) – এই হোক জলের প্রতি আমাদের আচরণ।।

****

তুলিকলম

প্রসঙ্গঃ ছোটদের ইচ্ছেডানা এবং ছবি আঁকা

~ সুভম মুখার্জী, সহযোগী সম্পাদক

কেজিখানেক ওজনের স্কুলব্যাগটা, হাজার গন্ডা হোমওয়ার্ক, লোকডাউনের মধ্যে অনলাইন পড়াশুনো- বড্ড নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট কচি মুখগুলো। অঙ্ক-ইংরিজি-ইতিহাসের মাঝে ফিকে হয়ে যাওয়া শৈশবে একটু রং ছড়িয়ে দিতে হিরণ্যগর্ভ- এর ছোটদের পাতার সংযোজন। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন শরীরকে সতেজ রাখে তেমনি এই দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতার চাপ সামলে কচিকাঁচাদের মানসিক স্বাস্থ্য সতেজ রাখাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই মানসিক খাদ্যের যোগান দেয় সৃজনাত্মক কাজ। তার মধ্যে অন্যতম ছবি আঁকা। একটা সাদা কাগজে রং দিয়ে নানান আঁকিবুকির মধ্যে দিয়ে সাতরঙা রামধনুর সেতু পেরিয়ে এক আনন্দের জগৎ ছোটরা খুঁজে পাবে। কল্পনার রঙিন জগতে বুকভরা নিশ্বাস নিয়ে সে এগিয়ে চলবে রোজ। উন্মোচিত হোক ছোটদের সুপ্ত শিল্পীসত্তা, মনের আনন্দে ছবি এঁকে চলুক তারা। সঙ্গে থাকুক হিরণ্যগর্ভ।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা, তাই তো বলছি -

একছুট্টে বই খাতা ফেলে
বিশাল দুটো ইচ্ছে ডানা মেলে
রামধনু ধরে ছুটে চলে আয়,
ভুলে গিয়ে সব হোমওয়ার্ক কাজ
রং-তুলি তে শৈশব আজ
রঙিন হোক আঁকার ছোঁয়ায়।

।। শিশুশিল্পী পরিচিতি ।।

অহেলী মাঝি (বয়স ৮, বীরভূম) • কঞ্জনাভ মৈত্র (বয়স ৯, শিলিগুড়ি) • আদিত্য সিনহা (বয়স ৮, ব্যাংগালুরু) • সাত্যকি আচার্য (বয়স ৭, হায়দ্রাবাদ) • ধৈবত বিশ্বাস (বয়স ৮, শিলিগুড়ি) • দিবিজা হোড় (বয়স ৬, শিলিগুড়ি) • ঋষভ সেনগুপ্ত (বয়স ৮, অস্ট্রেলিয়া) • শতক্রতু ব্যানার্জী (বয়স ৮, শিলিগুড়ি) • মিতাংশু পোদ্দার (বয়স ১০, শিলিগুড়ি) • নভোদিতা পাল (বয়স ৬, শিলিগুড়ি) • রুদ্রনীল সরকার (বয়স ৮, শিলিগুড়ি) • অভীপ্সা ব্যানার্জী (বয়স ৮, শিলিগুড়ি) • হৃদিকা দাস (বয়স ৭, দার্জিলিং) • সৌরদিত্য রায় (বয়স ৩, শিলিগুড়ি)

শিশুশিল্প

অহেলী মাঝি
(বয়স ৮, বীরভূম)

কঞ্জনাভ মৈত্র
(বয়স ৯, শিলিগুড়ি)

আদিত্য সিনহা
(বয়স ৮, ব্যাংগালুরু)

শিশুশিল্প

সাত্যকি আচার্য
(বয়স ৭, হায়দ্রাবাদ)

ধৈবত বিশ্বাস
(বয়স ৮, শিলিগুড়ি)

দিবিজা হোড়
(বয়স ৬, শিলিগুড়ি)

শিশুশিল্প

ঋষভ সেনগুপ্ত
(বয়স ৮, অস্ট্রেলিয়া)

শতক্রতু ব্যানার্জী
(বয়স ৮, শিলিগুড়ি)

শিশুশিল্প

মিতাংশু পোদ্দার
(বয়স ১০, শিলিগুড়ি)

নভোদিতা পাল
(বয়স ৬, শিলিগুড়ি)

শিশুশিল্প

রুদ্রনীল সরকার
(বয়স ৮, শিলিগুড়ি)

অভীপ্সা ব্যানার্জী
(বয়স ৮, শিলিগুড়ি)

শিশুশিল্প

হৃদিকা দাস
(বয়স ৭, দার্জিলিং)

সৌরদিত্য রায়
(বয়স ৩, শিলিগুড়ি)

আগামী সংখ্যা

শারদীয়া ১৪২৭ সংখ্যার জন্য লেখা আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

বিষয়: **“দুর্গা হাসেন, দুগ্‌গা কাঁদে”**

লেখা জমা দেওয়া যাবে মহালয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র আমাদের ই-মেল (**hiranyagarvo@gmail.com**) করে। জমা দেওয়ার নিয়মাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ওয়েবসাইটের ‘লেখা পাঠান’ পাতাটি। আপনাদের মতামত জানাতে আমাদের লিখুন ‘যোগাযোগ’ পাতায়। বিষদ জানতে দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট: www.hiranyagarvo.in

এছাড়া নিয়মিত দেখতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ: www.facebook.com/hiranyagarvo

সম্পাদকমণ্ডলী

শুভ্রদেব সেন, প্রধান সম্পাদক
পৌলোমী সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক
বীথি সরকার, সহযোগী সম্পাদক
মিহির দে, সহযোগী সম্পাদক
সুভম মুখার্জী, সহযোগী সম্পাদক
অভিশ্রুতি রায়, সহযোগী সম্পাদক

হিরণ্যগর্ভ পাবলিকেশন হাউস
২৩/২০৫, VBHC Vaibhava
আনেকাল মেইন রোড, ব্যাংগালুরু, কর্নাটক, পিন – ৫৬২ ১০৬।
ই-মেল: hiranyagarvo@gmail.com. ওয়েবসাইট: www.hiranyagarvo.in